বাঙালী টোলা

নিমাই ভট্টাচার্য

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৭২

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রণে
এইচ. পি. রায় এণ্ড কোং
৭৩/এ আমহার্স্ট রো
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

উৎসর্গ

শ্রীপ্রশান্ত ভাদুড়ী

বন্ধুবরেষু

টিকিট কালেক্টরের হাতে টিকিট দিয়ে সুবোধবাবু এক পা এগুতে না এগুতেই প্রায় শতখানেক রিক্‌শাওয়ালা ওঁকে ছেঁকে ধরল। কেউ কেউ হাত ধরে বলে, আইয়ে বাবুজি, চলিয়ে বাবুজি। কেউ কেউ আবার ওঁর হাতের ছোট স্যুটকেসটা নিয়ে টানাটানি করতে করতে জিজ্ঞেস করল, কাঁহা যানা সাব ?

শুধু ওঁকে না, সব প্যাসেঞ্জারকেই ওরা ঘিরে ধরছে। কী করবে ওরা ? এ শহরে কোন রিক্‌শাওয়ালাই দিন-রাত্তির খেটে দশ-বারো টাকার বেশি কামাই করতে পারে না। মালিকের পাওনা মিটিয়ে বিবি-বাচ্চার পেট চালানোই দায়। যা দিনকাল পড়েছে !

সারা দিনরাত্তিরে দশ-বারোটা ট্রেন আসে ঠিকই কিন্তু ভোরবেলার এই গাড়িতেই সব চাইতে বেশি প্যাসেঞ্জারের আসা-যাওয়া হয়। তাইতো এই গাড়ির প্যাসেঞ্জার ধরতে না পারলে রিক্‌শাওয়ালাদের সারা সকালটাই মাটি হয়ে যাবে। কিন্তু এত রিক্‌শার প্যাসেঞ্জার কি আছে ?

সুবোধবাবু খানিকটা এগিয়ে শেষ পর্যন্ত একজন বয়স্ক রিক্‌শা-ওয়ালার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। কী করবেন ? কতজনের টানাটানি কতক্ষণ সহ্য করা যায় ?

শিকার ধরার মহানন্দে রিক্‌শা ওয়ালা এক লাফে সীটে উঠেই একটু পিছন ফিরে জিজ্ঞেস করল, কাঁহা যানা সাব ?

বাঙালীটোলা।

ডান পা দিয়ে প্যাডেলে জোরে একটা চাপ দিয়েই আবার প্রশ্ন করে, কিসকা ঘর যানা সাব ?

রাজাবাবু কা কোঠি। সুবোধবাবু একটু থেমেই বললেন, উকিল মহেন্দ্রবাবুর বাড়ি। চেনো তো ?

ট্রেনের প্যাসেঞ্জার নিয়ে অনেকগুলো রিক্‌শা এক সঙ্গে বেরিয়েছে বলে রাস্তায় বেশ ভিড়। ক্রীং ক্রীং করে বেল বাজিয়ে, চিৎকার করে এরই মধ্যে সুবোধবাবুর রিক্‌শাওয়ালা একটু এগিয়ে বলে, সব পুরানা বাঙালীবাবুদের কোঠি আমি চিনি। আর রাজাবাবুর ছোট ছেলের কোচোয়ান ছিল তো অমার বড় চাচা।

সুবোধবাবু সিগারেট ধরিয়েই বলেন, তাই নাকি ?

আমি নিজেও তো ঝণ্টুবাবুর কাছে কাজ করেছি।

আচ্ছা !

আচ্ছা বললেও সুবোধবাবু কিন্তু ঝণ্টুবাবুকে চেনেন না। নামও শোনেননি কোনদিন। এই রাজাবাবুর পরিবারের বিষয়ে উনি কোন কিছুই জানেন না। ওঁদের কাউকে চেনেনও না। শুধু মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গেই মাত্র মাস কয়েক আগে মেজ মাসীমার ওখানে আলাপ হয়েছে। তাও নেহাতই হঠাৎ।

সুবোধবাবুকে ওঁর মা অনেকদিন ধরেই বলছিলেন, হ্যাঁরে আদু, তুই হরদম হিল্লী-দিল্লী ঘুরছিস আর যাতায়াতের পথে একবার রাঁচীতে নেমে মেজদিকে একটু দেখতে পারিস না ? উনি একটু থেমে বললেন, এই মেজ মাসী কি তোদের জন্য কম করেছে ?

সুবোধবাবু একজন প্রবীণ অধ্যাপক। ওঁর বহু ছাত্র নানা জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছেন। তাদের অনেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত। কেউ কেউ খ্যাতিনানও। তাইতো তাদের অনুরোধে বা চাপে সুবোধবাবুকে নানা কারণে ছুটতে হয় এখানে-ওখানে। প্রায় সারা দেশেই বলা যায় কিন্তু সত্যি রাঁচী যাবার অবকাশ বা সুযোগ হয় না। উনি ওঁর মাকে বললেন, দেখি, যদি সম্ভব হয় সামনের বার নাগপুর থেকে ফেরার সময় টাটায় নেমে রাঁচী ঘুরে আসব।

ঐ মেজ মাসীর ওখানে গিয়েই হঠাৎ মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আলাপ। পরিচয়ও ঠিক নয়। একথা-সেকথার পর মেজ মাসী ওঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে আদু, ছেলের বিয়ে দিবি না ?

সুবোধবাবু একটু হেসে বললেন, মা তো নাতির বিয়ে দেবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছেন কিন্তু কোন মেয়েকেই মা বা তাঁর নাতির পছন্দ হচ্ছে না।

মেজ মাসী সঙ্গে সঙ্গে মহেন্দ্রবাবুর দিকে তাকিয়ে এক গাল হাসি হেসে বললেন, কি মহিম, ঘটকালী করব নাকি ?

মহেন্দ্রবাবু একটু সকৃতজ্ঞ হাসি হেসে বললেন, যদি ওঁরা দয়া করে আমাদের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক করতে চান···

ওঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মেজ মাসী বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন, তোদের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক করা তো ভাগ্যের ব্যাপার। হাজার হোক তোরা রাজা অবলাকান্তের নাতি!

কথাটা শুনে অর্থনীতির যশস্বী অধ্যাপক সুবোধবাবু মুগ্ধ হতে পারেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে এই বিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত বাংলা-বিহার-উত্তরপ্রদেশে যেসব বাঙালী পরিবার খ্যাতি অর্জন ব. , তাঁদের ক'জন উত্তরপুরুষ সেই খ্যাতি, গৌরব অম্লান রাখতে পেরেছেন? তবে উনি মুখে কিছু বললেন না। চুপ করে থাকেন।

পারিবারিক গৌরবের ইঙ্গিত পেয়েও সুবোধবাবুর মধ্যে বিন্দুমাত্র কোন প্রতিক্রিয়া না দেখে মহেন্দ্রবাবু মনে মনে একটু ব্যথা অনুভব করেন। কিন্তু হাজার হোক উকিল তো! মনের ভাব মনের মধ্যেই লুকিয়ে একটু গদ্‌গদ হয়ে বললেন, আমার কন্যাটিকে যদি দয়া করে ওঁরা পছন্দ করেন···

এবারও মেজ মাসী মাঝপথে কথা বলেন, তোদের বংশে কি কুচ্ছিত ছেলেমেয়ে জন্মেছে?···

এবার সুবোধবাবু মনে মনে সত্যি একটু বিরক্ত হন।

মেজ মাসী বলে যান, তাছাড়া মহিম, তোর মেয়ে তো সাক্ষাৎ রাজকন্যা? ও ছুঁড়ীর মত রূপসী তো চোখে পড়ে না।

এত বাড়াবাড়িতে বোধ হয় মহেন্দ্রবাবুও একটু কুণ্ঠিত না হয়ে পারেন না। বলেন, না, না, পিসী, অত বলবেন না। তবে হ্যাঁ, আমার মেয়েটি মোটামুটি সুন্দরী। দেখলে হয়তো অপছন্দ হবে না।

এতক্ষণ পর বোধ হয় মেজ মাসীর হুঁশ হয়েছে, শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের দিকে একটু বেশী ঝোল টেনেছেন। তাই উনি এবার মহেন্দ্রবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, বুঝলি মহিম, আমার বাবা তো আমাদের কোন বোনকেই আজেবাজে পরিবারে বা পাত্রের হাতে দেননি!

সেকি আমি জানি না ? মোসাহেবীর সুরে মহেন্দ্রবাবু মন্তব্য করেন।

এই আত্নুর বাবা কলকাতায় গবরমেণ্টের কলেজে সব চাইতে বড় প্রফেসার ছিলেন। রিটায়ার করার দশ-বারো বছর আগে প্রিন্সিপ্যাল হন। এই আত্নু তো কত বছর বিলেতে থেকে পড়াশুনা করেছে !···

সুবোধবাবু একটু হেসে বলেন, মেজ মাসী, বাবার বা আমার কথা বলে কি হবে ? আসলে পাত্রটিকে যদি ওঁদের পছন্দ হয়···

মহেন্দ্রবাবু গদ্‌গদ হয়ে বললেন, কি যে বলেন আপনি ?

মেজ মাসী একটু শাসন করার ভান করে বলেন, আঃ ! আমাকে বলতে দে। এবার উনি রাজা অবলাকান্তর নাতির দিকে তাকিয়ে বলেন, শোন মহিম, আত্নুর ছেলেও বিলেত থেকে পাস করে এসেছে। হীরের টুকরো আমার নাতি ! যেমন রূপ, তেমন গুণ !

বাপ-ঠাকুর্দার মতই···

ডাক্তার অঘোরনাথ চৌধুরীর দ্বিতীয়া কন্যা যোগমায়া দেবীর এই একটি রোগ ! বড্ড কথা বলেন। শুধু তাই নয়। অন্য কাউকে কথা বলার সুযোগও দেন না। মহেন্দ্রবাবুকে আবার বাধা দিয়ে বললেন, ও ছেলে বাপ-ঠাকুর্দার চাইতে অনেক বেশী নাম করবে। বাপ-ঠাকুর্দা আর ক'খানা বই লিখেছে ? ঐ কচি ছেলে এর মধ্যেই পাঁচ-সাতটা মোটা মোটা বই···

সুবোধবাবু একটু সংশোধন করে দেন, না মেজ মাসী, বাবুলের মাত্র তুটো বই বেরিয়েছে।

ঐ একই ব্যাপার ! এই বয়সেই যদি মোটা মোটা তুটো বই লিখে থাকে, তাহলে···

যাই হোক ঐ রাঁচীতে মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে সুবোধবাবুর আলাপ হয়। যোগমায়া দেবী পূজা করতে গেলে মহেন্দ্রবাবু সবিনয়ে নিবেদন করেন, পারিবারিক ব্যাপারে বেশী আর কি বলব ? তবে

আমার ঠাকুর্দা বিহার-উত্তরপ্রদেশের প্রবাসী বাঙালীসমাজে সত্যি গণ্যমান্য পুরুষ ছিলেন। আর আমি সামান্য উকিল···

সামান্য কেন হবেন? সুবোধবাবু একবার ওঁর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে একটু হেসে বলেন, আপনাকে দেখে তো স্যার আশুতোষের কথা মনে পড়ে যায়।

কি যে বলেন!···

আপনার ক'টি সন্তান?

আমার তিনটি কন্যা। বড় মেয়েটির বিয়ে দিয়েছি বছর দুয়েক আগে। আমার দ্বিতীয় কন্যাটি এই বছরই এম. এ. পাস করল।···

বাঃ! শিক্ষাবিদ সুবোধবাবু শুনে খুশিই হন।

এবং শুনে খুশি হবেন, ফার্স্ট ক্লাসই পেয়েছে।

খুব ভাল।

মহেন্দ্রবাবু আরও অনেক কথা বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু সুবোধবাবু বললেন, অত কিছু বলার প্রয়োজন নেই। মোটামুটি শিক্ষিতা ও সুন্দরী মেয়েই আমরা চাই।

উনি এবার নিজের পুত্রের বিষয়ে বলেন, হাজার হোক আপনি মেয়ের বিয়ে দেবেন। নিশ্চয়ই পাত্রকে ভাল করে দেখে-শুনে নেবেন।···

অত দেখাশুনার কি আছে? পিসীর কাছে যা শুনলাম···

উনি যাই বলুন, আপনি না দেখেশুনে একটি ছেলের হাতে অমন ভাল মেয়েকে তুলে দেবেন কেন। সুবোধবাবু একটু থেমে বলেন, আমার ছেলেটি স্বাস্থ্যবান এবং সুপুরুষও বলতে পারেন। ও প্রেসিডেন্সি থেকে পাস করে এল-এস-ই থেকে মাস্টার্স করেছে।—

এল-এস-ই মানে?

প্রশ্ন শুনে সুবোধবাবু একটু দুঃখই পান। তবে সঙ্গে সঙ্গে বলেন, লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স।

ওঃ!

এখন জে-এন-ইউ তে পড়ায়। মাইনে—

জে-এন-ইউ তে কী ?

ওঃ! সরি! জে-এন-ইউ মানে দিল্লীর জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি।

আচ্ছা! আচ্ছা!

এল-এস-ই এবং জে-এন-ইউ সম্পর্কে ভদ্রলোকের প্রশ্ন শুনেই সুবোধবাবু স্পষ্ট বুঝলেন, ওঁদের পারিবারিক ঐতিহ্যের গঙ্গা এখনও প্রবাহিত থাকলেও শিক্ষাদীক্ষাব ধারা ফল্গুর মতই বিলুপ্ত! বি. এ. এম. এ. পাস করলেই কি শিক্ষিত বা সংস্কৃতিবান হওয়া যায় ?

যাই হোক রাঁচীতে আলাপ-আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সুবোধবাবু দিল্লী রওনা হবার আগে ওঁকে চিঠি দেন, আপনার পত্রের জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আমার মা ও তাঁর নাতি যাকে পছন্দ করবেন, তাকেই পুত্রবধূ করে ঘরে আনব কিন্তু আপনারা দূরের বাসিন্দা বলে ওরা দুজনেই আমার উপর প্রাথমিক নির্বাচনের দায়িত্ব দিয়েছেন···

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি আঞ্চলিক সেমিনারে যোগ দেবার জন্য আমি আগামী সোমবার দিল্লী যাচ্ছি। পনেরই পর্যন্ত সেমিনার চলবে। দিল্লীতে আমারও কিছু কাজ আছে। তাছাড়া পুত্রের আগামী বইটির পাণ্ডুলিপিও পড়তে হবে। যাইহোক মোটামুটি কুড়ি-বাইশ তারিখ নাগাদ দিল্লী থেকে রওনা হয়ে আপনাদের ওখানে আসব বলে মনস্থির করেছি। ইচ্ছা আছে, একবেলা আপনাদের কাছে থেকেই কলকাতা রওনা হব। এখানে আমার অনেক কাজ।

সেই সুবাদেই সুবোধবাবু বহু প্রবাসী বাঙালীর উজ্জ্বল স্মৃতি বিজড়িত এই শহরে এসেছেন।

বৃদ্ধ রিক্‌শাওয়ালা রিক্‌শার প্যাডেল ঘুরোতে ঘুরোতেই আপন মনে একটু হেসে বলে, ঝণ্টুবাবু বহুত মজাদার আদমী ছিলেন। ইয়ার-দোস্তদের নিয়ে লাচ-গান শোনার জন্য উনি কত রুপেয়া খরচা করতেন!

সুবোধবাবু একটু হাসেন।

ও একটু থেমেই বেশ গর্বের সঙ্গে বলে, জানেন সাব, ঝন্টুবাবুর শরাব বিলাইত থেকে আসত।

উনি একটু উৎসাহ দেবার সুরেই বলেন, সত্যি ?

আরে সাব, আমি কি আপনাকে ঝুট বলব ? এ শহরের সবাই ওঁর কথা জানে।

এদিক-ওদিক ঘুরে-ফিরে রিক্শা এগিয়ে চলে। রিক্শাওয়ালা আপন মনেই বলে যায়, আরে সাব, রহিশ আদমীদের কারবারই আলাদা! ঝন্টুবাবুর ছটো বিবি ছিল, দু-তিনটে আওরাতকেও উনি রেখেছিলেন। এছাড়া লক্ষ্ণৌ-কাশী থেকেও বাইজী এনে কয়েক মাস নিজের কাছে রাখতেন।

শুনেই সুবোধবাবুর সারা শরীর ঘিনঘিন করে ওঠে। রাগও হয়। একবার মনে মনে ভাবেন, যে পরিবারে ঝন্টুবাবুর মত সুসন্তান জন্মেছেন, সেই পরিবারের মেয়েকে উনি পুত্রবধূ করে ঘরে আনতে পারেন না। আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, যে কোন বড় পরিবারেই এ ধরনের দু-একটি রত্ন থাকতেই পারে কিন্তু তাদের জন্য নিরপরাধ বংশধররা শাস্তি পাবে কেন ?

হঠাৎ উনি প্রশ্ন করেন, তুমি কি ঝন্টুবাবুর কাজ ছেড়ে দিয়েছিলে ?

ছেড়ে দেব না ? বৃদ্ধ রিক্শাওয়ালার সুরই বদলে গেল। বলল, সাব, বলতে শরম হয়।

শরম লাগলেও ও থামে না। বলে, একদিন রাত্রে শরাব খেয়ে উনি আমার বিবির ইজ্জত নষ্ট করতে আসেন।...

সুবোধবাবু মুখ বিকৃত করে অজান্তেই বলেন, ইস !

...সাব, তখন আমি জোয়ান বেটা! বিবিও জোয়ান লেড়কী। কোন বাল-বাচ্চাও হয়নি। ঝন্টুবাবুর ঐ কাণ্ড দেখে আমার মাথায় খুন চড়ে গেল। ভুলে গেলাম উনি আমার মালিক আছেন। হাতের কাছেই একটা বাঁশ পেয়ে আমি দমাদম ওঁকে পেটাতে শুরু করি।

ও একবার নিঃশ্বাস নিয়ে আবার বলে, তারপর ঝন্টুবাবুর হুকুমে

হুটো দারোয়ান চাবুক দিয়ে মারতে মারতে আমাকে আধমরা করার পর…

বল কী?

রিক্‌শা চালাতে চালাতেই ও মুহূর্তের জন্য পিছন ফিরে বলল, ভগবান কী কসম সাব! সব সাচ্‌ হ্যায়।

তুমি কিছু বললে না?

আমি গরীব আদমী। আমি কি বলব? ও বোধহয় একটু হাসে। বলে, সাব, ঝণ্টুবাবু সেদিন রাত্রে আমাকে আর আমার বিবিকে নাংগা করে বের করে দেন।

শুনে সুবোধবাবুর মত শান্ত মানুষেরও রক্ত যেন টগ-বগ করে ফুটতে থাকে। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করেন, এ কতদিন আগেকার ঘটনা?

সাব, তখন আংরেজ জমানা। লড়াই ভী চলছিল!

উনি বুঝতে পারেন, যুদ্ধের সময়ের কথা।

হঠাৎ রিক্‌শাটা মোড় ঘুরে ঢালু রাস্তায় এসে খুব জোরে ছুটতে শুরু করল কিন্তু বেশি দূর যাবার আগেই রিক্‌শাওয়ালা ব্রেক কষে একটা বিরাট দোতলা বাড়ির সামনের মাঠে ঢুকল।

এই কি রাজাবাবুর বাড়ি?

হাঁ সাব!

গাড়িবারান্দার নিচে রিক্‌শা থামতে না থামতেই মহেন্দ্রবাবু প্রায় ছুটে এসে অভ্যর্থনা করলেন, আসুন, আসুন!

ছোট্ট সুটকেসটা পাশে নামিয়ে রেখেই রিক্‌শাওয়ালা ছু' হাত জোড় করে মহেন্দ্রবাবুকে বলল, প্রণাম সাহাব!

হাজার হোক রাজাবাবুর বংশধর! একজন তুচ্ছ রিক্‌শাওয়ালার দিকে মুহূর্তের জন্য নজর দেওয়াও বোধহয় অমার্জনীয় অপরাধ! তাই মহেন্দ্রবাবু ওর কথায় কান দিলেন না।

সুবোধবাবু রিক্‌শা থেকে নামার আগেই ছুটো টাকা রিক্‌শাওয়ালার

দিকে এগিয়ে দিতেই মহেন্দ্রবাবু হঠাৎ যেন ক্ষেপে উঠলেন, আহা হা! মোটে ষাট পয়সা ভাড়া।

স্থবোধবাবু একটু হেসে বললেন, আমি অর্থনীতির অধ্যাপক। আমি জানি কতটুকু পরিশ্রম করলে কি পারিশ্রমিক পাওয়া উচিত। এবার উনি রিক্‌শাওয়ালার হাতে তু-টাকার নোটটি গুঁজে দিয়ে বললেন, আমি দিচ্ছি। তুমি রেখে দাও। সাহেব একটুও রাগ করবেন না।

কন্যার বিয়ের ব্যাপার না হলে মহেন্দ্রবাবু নিশ্চয়ই এত বড় অন্যায় বরদাস্ত করতেন না। উনি বেশ গর্বের সঙ্গেই বললেন, আগে কোন গাড়ি-ঘোড়া এ বাড়িতে ঢুকলে ধন্য মনে করত। জোর করলেও কেউ ভাড়া নিত না।

একজন চাকর স্থটকেসটি নিয়ে প্রায় দৌড়ে দোতলায় উঠল।

মহেন্দ্রবাবু সম্মানিত অতিথিকে নিয়ে ধীর পদক্ষেপে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলেন, এই রিক্‌শাওয়ালা হারামজাদাই এক কালে আমার বাবাকে তু'বেলা মালিশ করত।

আচ্ছা?

হ্যাঁ স্থবোধবাবু!

॥ তুই ॥

স্থবোধবাবু এ বাড়িতে পা দিয়েই খেয়াল করেছেন, এককালে এ বাড়ির সিঁড়ি ও মেঝে ইটালিয়ান মার্বেল দিয়ে মোড়া ছিল। এখনও যে নেই, তা নয়। মেঝের সর্বত্র না হলেও অনেক জায়গাতেই আছে কিন্তু সিঁড়িতে প্রায় নেই বললেই চলে। তাদের শূন্য স্থান পূর্ণ হয়েছে সিমেন্ট-বালি দিয়ে। গরমের দিনে মুখে পাউডার মাখার মত কোন কোন জায়গায় ঐ সিমেন্ট-বালির উপর একটু সাদা সিমেন্টের প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। গ্রাম্য যাত্রার দলে পুরুষ নর্তকী যেমন বেমানান, তেমনই বীভৎস?

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই স্থবোধবাবু প্রশ্ন করেন, আচ্ছা মহেন্দ্রবাবু, এ বাড়ি কতদিনের হল?

তা একশ' বছরের উপর হল। মহেন্দ্রবাবু পাশ ফিরে ওঁর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলেন, আঠারোশ' উনষাট সালে আমার গ্রেট গ্র্যাণ্ড-ফাদার ইংরেজদের কাছ থেকে প্রথম জমিদারী পান।···

তার মানে সিপাহী মিউটিনির পর পরই ?

হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন।

সুবোধবাবু আর কোন প্রশ্ন না করলেও রাজাবাবুর বংশধর ওঁদের একদা গৌরবের কাহিনী বলে যান, ঐ জমিদারী পাবার পর আমার গ্র্যাণ্ড-ফাদার রাজা অবলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বিহার-উত্তরপ্রদেশের সাতটি বড় বড় শহরে সাতটি প্যালেস তৈরী করেন।···

এত কথা শোনার পর কি চুপ করে থাকা উচিত ?

নিতান্ত সৌজন্যের জন্য সুবোধবাবু বলেন, আচ্ছা ?

এবার মহেন্দ্রবাবু একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বলে, ঐ সাতটি প্যালেসের মধ্যে এইটি সবচাইতে ছোট !

সুবোধবাবুও একটু হাসেন। বলেন, আপনার গ্রেট গ্র্যাণ্ড-ফাদারের রুচি ও মেজাজ দেখছি সত্যি রাজামহারাজের মতই ছিল।

সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উনি একটু থেমে, একটু হেসে বলেন, আপনি খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম করুন। তারপর ওঁর গল্প শোনাব।

দোতলার বিরাট বারান্দায় পা দিয়েই সুবোধবাবু বললেন, এবার আর ওঁর গল্প শোনা হবে না···

কেন ? আপনি কি ইণ্টারেস্টেড না ?

না, না, তা না। আমি আজ বিকেলের গাড়িতেই চলে যাব।···

এ কথা শুনেই মহেন্দ্রবাবু যেন চমকে উঠলেন। থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, না, না, তা কখনোই হতে পারে না। আপনাকে অন্তত দু'চারদিন থাকতেই হবে।

বারান্দা দিয়ে এগুতে এগুতেই সুবোধবাবু অত্যন্ত ধীর স্থিরভাবে বললেন, না মহেন্দ্রবাবু, এ যাত্রায় দয়া ক'রে আমাকে যেতে দিন। কাল কলকাতায় আমার অনেক কাজ।

কিছু ভিক্টোরিয়ান, কিছু মামুলী ফার্নিচার দিয়ে সাজানো ড্রইংরুমে পা দিয়েই মহেন্দ্রবাবু বললেন, কিন্তু···

এবার দয়া করে আমাকে বাধা দেবেন না। সত্যি আমার অনেক কাজ। উনি পুরনো দিনের একটা সোফায় বসতে বসতে বললেন, মা আর মেজ মাসীর জন্য এখন এলাম। হয়তো···

এবার মহেন্দ্রবাবু ওঁর কথার কোন জবাব না দিয়ে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মত হুঙ্কার দিলেন, বাবুলাল?

বাবুলাল দরজার আড়ালেই দাঁড়িয়েছিল প্রভুর স্নেহের ডাক শুনেই সে আত্মপ্রকাশ করে বলে, জী হুজুর!

চা আন।

বাবুলাল জী হুজুর বলে ভিতরের দিকে পা বাড়াতেই প্রভু আবার হুকুম করলেন, আর শোন, মাকে আসতে বল।

জী হুজুর! ও এবার দৌড়ে ভিতরে গেল।

এই ড্রইংরুম দেখে সুবোধবাবুর মনে হল, এক অতীত ইতিহাসের অন্ধকার ভগ্নস্তূপের মধ্যে বসে আছেন। মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পা বা নালন্দা-বিক্রমশীলাও তো ভগ্নস্তূপ! কিন্তু ঐসব ভগ্নস্তূপের প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে মানবসভ্যতার গৌরবময় কাহিনী, ঐতিহ্য জড়িয়ে আছে। আর এখানে? ভাবতে গিয়েও বোধ হয় ওঁর লজ্জা হয়। তবু উনি বেশ আগ্রহের সঙ্গেই চারপাশ দেখেন।

কী আর দেখবেন সুবোধবাবু? এখন তো আমরা ভিখারী! আক্ষেপ করে মহেন্দ্রবাবু বলেন।

ছি, ছি, ওকথা বলবেন না।

সত্যি কথাই বলছি সুবোধবাবু। যা ছিল তার তুলনায় ভিখারী বৈকি!

গভর্নমেণ্ট জমিদারী নিয়ে নিলে···

ওঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই উনি বলেন, গভর্নমেণ্ট জমিদারী নেবার আগেই আমাদের বারো আনা টাকাকড়ি-সম্পত্তি বাবা বেচে দেন।

কেন? সুবোধবাবু একটু বিস্ময় প্রকাশ করেই জিজ্ঞেস করেন, উনি বুঝি খুব আমুদে লোক ছিলেন?

মহেন্দ্রবাবু প্রায় চিৎকার করে ওঠেন, না, না, নট অ্যাট অল! নট অ্যাট অল! হি ওয়াজ এ গ্রেট ন্যাশনালিস্ট।

তাই নাকি?

উনি ন্যাশনালিস্ট লীডার ও কর্মীদের দু'হাতে টাকা বিলিয়েছেন। পরিচিতদের মধ্যে যারা জেলে যেতেন, তাদের ফ্যামিলীকে ঠিক নিজের ফ্যামিলীর মত প্রতিপালন করতেন।

সুবোধবাবু মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন।

উনি প্রায় এক নিশ্বাসেই বলে যান, টেররিস্ট মুভমেণ্টের সময় টেররিস্টদের লুকিয়ে রাখার জন্য উনি কয়েকজন বাঈজীকে বছরের পর বছর রেখে দেন।

বাঈজীদের বাড়িতে টেররিস্টদের লুকিয়ে রাখেন?

সম্মতিতে মাথা নাড়িয়ে একগাল হাসি হেসে মহেন্দ্রবাবু বেশ গর্বের সঙ্গেই বলেন, পুলিসের গোয়েন্দারা কি জমিদারের বুদ্ধির সঙ্গে···

সুবোধবাবু বেশ জোরেই হেসে ওঠেন।

মহেন্দ্রবাবু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, কিন্তু দেশের জন্য এত ক্ষতি স্বীকার করেও বাবার কত বদনাম হয়েছে জানেন?

আরে ওসব গ্রাহ্য করতে নেই।

এ বিষয়ে আর কোন কথাবার্তা হবার আগেই মহেন্দ্রবাবুর স্ত্রী ড্রইংরুমে ঢুকলেন। চা-জলখাবারের ট্রে নিয়ে ওঁর পিছন পিছন বাবুলাল এল।

আমার স্ত্রী! মহেন্দ্রবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন।

মিসেস ব্যানার্জী ও সুবোধবাবু প্রায় একই সঙ্গে নমস্কার ও প্রতি-নমস্কার করলেন।

সেণ্টারটেবিলে চা-জলখাবারের পাত্র রাখতে রাখতে মিসেস ব্যানার্জী বললেন, আমার শ্বশুরমশায়ের খুড়তুতো বোনের দূরসম্পর্কের ননদ হলেও যোগমায়া পিসী আমাদের অত্যন্ত স্নেহ করেন।···

মহেন্দ্রবাবু বললেন, একটু চা খান।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়েই সুবোধবাবু একটু হেসে বললেন, হ্যাঁ, তা জানি।

ভদ্রমহিলা পাশের একটা সোফায় বসে বললেন, ঈশ্বরের কি ইচ্ছা জানি না তবে আপনাদের মত শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত পরিবারে মেয়েকে দিতে পারলে আমরা ধন্য মনে করব।···

না, না, একথা বলবেন না। সুবোধবাবু আবার এক চুমুক চা খেয়ে বললেন, আজকাল তো সবাই শিক্ষিত। তাছাড়া আপনাদের মত ঐতিহ্য বা আভিজাত্য তো আমাদের নেই।

মিসেস ব্যানার্জী একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, ঐ নামেই তালপুকুর। আসলে ঘটি ডোবে না!

মহেন্দ্রবাবু চুপ করে থাকলেও ওঁর স্ত্রী বলে যান, ঐ ঐতিহ্য-আভিজাত্যই এখন অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ওঁর কথা শুনে সুবোধবাবু মনে মনে ওঁকে শ্রদ্ধা না করে পারেন না কিন্তু মুখে বলেন, কিন্তু ব্যক্তি বা সমাজজীবনে তো ঐতিহ্য-আভিজাত্যের একটা বিরাট ভূমিকা আছে।

ভূমিকা আছে বলবেন না। বলুন, ভূমিকা ছিল। উনি একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলেন, এ যুগে ঐতিহ্য-টৈতিহ্যের দাম ফুটো পয়সাও না।

এতক্ষণ পর মহেন্দ্রবাবু ওঁর স্ত্রীকে বললেন, এদিকে প্রফেসার সাহেব কী বলেছেন জানো?

কী?

উনি আজই বিকেলের ট্রেনে কলকাতা চলে যাবেন।

মিসেস ব্যানার্জী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, অসম্ভব!

সুবোধবাবু বললেন, কিন্তু কাল কলকাতায় আমার সত্যি অনেক কাজ।

নিশ্চয়ই কাজ আছে, কিন্তু দাদা আপনার মত মানুষকে তো কাছে পাই না! তাই এত তাড়াতাড়ি ছাড়তে পারব না।

এবার সত্যি সুবোধবাবু হাসতে হাসতে বলেন, শুনেছিলাম, আপনার স্বামী উকিল কিন্তু এখন দেখছি, আপনিই সিনিয়র অ্যাডভোকেট !

ওঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই হাসেন। ঐ হাসতে হাসতেই মিসেস ব্যানার্জী জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু মামলায় জিতেছি কিনা তা তো বললেন না ?

জজ সাহেব বলেছেন, এমন তুচ্ছ ব্যাপারে মামলা করাই অন্যায় হয়েছে ! তাই উনি দু-পক্ষকেই মিটমাট করে নিতে বলেছেন অধ্যাপক মুখার্জী চাপা হাসি হাসতে হাসতে কথাগুলো বললেন।

যাক তাহলে মামলায় হারিনি। অর্থাৎ আজ বিকেলে আপনি যাচ্ছেন না।

ঐ ড্রইংরুমে বসেই আরও এক রাউণ্ড চা খেতে খেতে ঠিক হল, সুবোধবাবু পরের দিন ভোরবেলার ট্রেনে রওনা হবেন।

সুবোধবাবু স্নান করে বেরুতেই ব্রেকফাস্টের ডাক পড়ল। উনি ডাইনিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াতেই মিসেস ব্যানার্জী বললেন, ছোট মেয়ে মামারবাড়ি গেছে। তাই এখন আমরা মাত্র তিনটি প্রাণী এখানে আছি। আমরা দুজনে আপনাব সঙ্গে গল্প করছি আর আমার মেজ মেয়ে একলা একলা ঘরের মধ্যে···

সুবোধবাবু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আপনাদের আপত্তি না থাকলে আমরা সবাই মিলেই তো গল্প করতে পারি।

ওঁরা স্বামী-স্ত্রী প্রায় একসঙ্গেই ডাক দিলেন, কৃষ্ণা, এদিকে আয়।

দক্ষিণ দিকের কোণার ঘর থেকে বেরিয়ে কৃষ্ণাকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসতে দেখেই সুবোধবাবু মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন।

॥ তিন ॥

বাঙালীকে যারা ঘরকুনো বলেন, তারা সত্যি বাঙালীর ইতিহাস জানেন না। আজ নয়, বাঙালী চিরকালই ঘর ছেড়ে অজানা দেশ-দেশান্তরের পথে বেরিয়ে পড়েছে। সেই অনাদি অতীতে কুরুক্ষেত্রের

যুদ্ধেও বাঙালী সেনারা যোগ দিয়েছিল। তবে হ্যাঁ, বাঙালী সেনারা সত্যাশ্রয়ী পাণ্ডবদের পক্ষে ছিল না। ওঁরা লড়াই করেছিলেন কুরু'র পক্ষে। শুধু সে সময় নয়, বাঙালী চিরকালই রাজাদের দলে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর কিছু বাঙালী ক্ষেপে গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু তাদের ঠাণ্ডা হতেও বেশি সময় লাগেনি। তারপর সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সময় কিছু বাঙালী রাজার বিরুদ্ধে হাতিয়ার ধরেছিল কিন্তু তাদের সহস্রগুণ বেশি বাঙালী তখন দেবজ্ঞানে রাজসেবা করেছেন। আগস্ট বিপ্লবের সময়ও বাঙালী রাজদ্রোহীদের চাইতে অনেক অনেক বেশি সংখ্যক বাঙালী পুলিস ও গোয়েন্দা সে বিদ্রোহ দমনে সব শক্তি নিয়োগ করেছিল। আজও আমরা অনেকেই এস. পি. ম্যাজিস্ট্রেট, মন্ত্রী দেখলে গদ্‌গদ না হয়ে পারি না।

বাঙালীর রক্তেই বোধহয় রাজভক্তির বীজ লুকিয়ে আছে। পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করলেও লর্ড ক্লাইভ বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তাছাড়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ঘর-সংসার সামলাতে কয়েকটা বছর তাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। তারপর একটু ফুরসত পাবার পর লর্ড ক্লাইভ বেরিয়ে পড়লেন এবং এলাহাবাদ যাবার সময় সঙ্গে নিলেন কলকাতা শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব মহাশয়কে। হাজার হোক একে রাজা নবকৃষ্ণ, তার উপর স্বয়ং লর্ড ক্লাইভের সঙ্গে বেরিয়েছেন। সুতরাং সাঙ্গপাঙ্গ অনেক ছিল এবং তাদেরই একজনের নাম গঙ্গাধর। শ্রীমান গঙ্গাধরের হাতে তৈরি তামাক না খেলে রাজা নবকৃষ্ণের তৃপ্তি হতো না।

যমুনা যেখানে পুণ্য পবিত্র জাহ্নবীতে আত্মসমর্পণ করে আত্মহারা হয়ে লুপ্ত সরস্বতীর সঙ্গে একাকার হয়েছে, সেই ত্রিবেণী সঙ্গমের শোভা দেখবার সময় লর্ড ক্লাইভ রাজা নবকৃষ্ণের সুপারিশে গঙ্গাধরের হাতে তামাক খেয়ে এমনই মুগ্ধ হয়ে যান যে সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ সহস্র মুদ্রা ও কোম্পানিতে একটি স্থায়ী চাকরি দেন। বাস! সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রবাসী বাঙালী পরিবারের জন্ম হল।

গঙ্গাধরের আদি নিবাস ছিল হুগলী। এবং তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন।

তার গলায় পৈতা থাকলেও পেটে শাস্ত্রজ্ঞান ছিল না। শুধু তাই নয়। পিতামহের শত চেষ্টাতেও তিনি শালগ্রামশিলার সেবা করতেও শিখলেন না বলে ঘর থেকে বিতাড়িত হন। শ্রীমান গঙ্গাধর মন্ত্র-তন্ত্র না জানলেও তামাক খেতে বড় ভালবাসতেন এবং সাজতেনও ভাল। ঐ বিদ্যাটুকু সম্বল করেই তিনি একদিন ঘুরতে ঘুরতে কলকাতা শহরে হাজির। বিধির বিধান কে খণ্ডাবে! একদিন আহিরীটোলার গঙ্গার ঘাটে রাজা নবকৃষ্ণের এক বিশ্বস্ত কর্মচারীর সঙ্গে এই ব্রাহ্মণ সন্তানের পরিচয় হয় ও তিনি তার দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনে বড়ই বিচলিত হন। ওঁরই কৃপায় গঙ্গাধর রাজা নবকৃষ্ণের রাজবাড়িতে প্রথমে আশ্রয় লাভ ও পরে স্নেহভাজন কৃপাপাত্র হয়ে ওঠেন।

যাই হোক লর্ড ক্লাইভ ও রাজা নবকৃষ্ণের বিদায়ের পর গঙ্গাধর কিছুকাল বিলাস-ব্যসনে জীবন কাটালেও অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কোম্পানির চাকরি করেন। ইতিমধ্যে হুগলী দেবানন্দপুর-ভাস্তাড়া অঞ্চলের এক ব্রাহ্মণ সপরিবারে তীর্থ ভ্রমণে এলে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের একান্ত অনুরোধে গঙ্গাধর তার কন্যাকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর গঙ্গাধর চাকরির সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানির কন্ট্রাক্টারী শুরু করেন ও প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। গঙ্গাধর মৃত্যুর সময় দুটি স্ত্রী, ন'টি পুত্র, পাঁচটি কন্যা, পাঁচটি নাতি-নাতনী, একটি অট্টালিকা, চার-পাঁচশ' ভরি সোনা, প্রায় মনখানেক রূপা, বিশ-ত্রিশ মণ বাসন-কোসন ও প্রায় পনেরো হাজার টাকা নগদ রেখে যান। তখন বোধ হয় সত্যি রাম-রাজত্ব ছিল!

গঙ্গাধরের মৃত্যুর পরই পরিবারের মহা অশান্তি দেখা দেয় ও আস্তে আস্তে সোনার সংসার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। বছর দশেকের মধ্যে গঙ্গাধরের বংশধররা প্রায় সারা উত্তরপ্রদেশে ছড়িয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে ইংরেজ রাজত্বের পাকা বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে। অফিস-আদালতের সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া শেখার বিধি-ব্যবস্থা ও ডাক্তারখানা চালু হল এবং এই সমস্ত বিভাগেই বাঙালীর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও একাধিপত্য ছড়িয়ে পড়ল। কোর্ট-কাছারির কৃপায় বাঙালী

উকিলবাবুরা তো রাজা হয়ে গেলেন। লোকে সাধে কি বলত, 'লড়ে টোপী-ওয়ালা, খায় ধোতিওয়ালা'! এইরকম এক ভাগ্যবান উকিল ছিলেন গঙ্গাধরের পঞ্চম পুত্র শ্রীধর বাঁড়ুজ্যে। কোম্পানির অনেক ইংরেজ কর্মচারীই এই শ্রীধর ব্যানার্জীর বন্ধু ছিলেন ও কালেক্টর লঙ সাহেবের কৃপায় তার জ্যেষ্ঠপুত্র ডাকমুন্সীর চাকরি পান। এর কিছুকাল পরে ডাকবিভাগ কালেক্টরের হাত থেকে সিভিল সার্জেনের অধীনে চলে যায় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অশ্ব ডাক চালু হয়। শ্রীধর-নন্দন ডাক অশ্বের কালেক্টর হন।

শ্রীধরবাবু সব পুত্রদেরই কিঞ্চিৎ ইংরেজি শিখিয়েছিলেন এবং সেই সামান্য ইংরেজি জ্ঞানের দৌলতে অন্য একটি পুত্রও অশ্ব ও গোডাক বিভাগে কাজ পান। এর নাম কামিনীরঞ্জন।

কামিনীরঞ্জন সত্যি একটি রত্ন ছিলেন। নিজের কর্ম দক্ষতায় উনি যে শুধু মাত্র ডেপুটি পোস্ট মাস্টার হন তাই নয়, সিপাহী বিদ্রোহের সময় উনি যেভাবে ইংরেজ সেনাপতি ও অফিসারদের সেবা করেন, তার তুলনা বিরল। বিদ্রোহী সিপাহী ও মুসলমানরা ইংরেজসেবক বাঙালীদের শত্রু মনে করতেন বলে তাদের অনেকের উপরই অকথ্য অত্যাচার হয়। ধন-সম্পত্তি ছাড়াও বহু বাঙালীকে প্রাণ হারাতে হয়। বিদ্রোহীরা কামিনীরঞ্জনকেও খুন করার পরিকল্পনা করেছিল কিন্তু উনি সে খবর আগেই জানতে পেরে পোস্ট অফিসের দামী ও দরকারী জিনিসপত্র ছাড়াও কিছু বিশ্বস্ত কর্মীকে নিয়ে পালিয়ে যান।

কামিনীরঞ্জন আত্মগোপন করে থাকার সময় বিশ্বস্ত কর্মী ও ইংরেজ সমর্থক কিছু সুচতুর গ্রামবাসীদের সাহায্যে বিদ্রোহী দলের গোপন খবর সংগ্রহ করে অত্যন্ত গোপনে ওয়াটসন সাহেবের এক ঘনিষ্ঠ অফিসারের কাছে পাঠাতেন অনেক সময় কামিনীরঞ্জন নিজেও জীবন বিপন্ন করে সাধুসন্ন্যাসী-ফকিরের বেশে শত্রু শিবিরে প্রবেশ করে সংবাদ সংগ্রহ করতেন। যাদের সক্রিয় ও ঐকান্তিক সাহায্যে মহামান্য ইংরেজ সরকার বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হয়, তাদের অন্যতম এই বাবু কামিনীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়।

দেশে শান্তি স্থাপনের পর ইংরেজ সরকার প্রকাশ্যে ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রচুর অর্থ ও ডেপুটি কালেক্টরের পদ দিয়ে পুরস্কৃত করেন সে সময় উত্তরপ্রদেশের বেশ কিছু বাঙালী চরম রাজভক্তি দেখাবার জন্য এই দুর্লভ সম্মান লাভ করেন।

কামিনীরঞ্জনের কাহিনী, সৌভাগ্যের ইতিহাস এখানে শেষ নয়। কোম্পানির জমানা শেষ হবার পর স্বয়ং মহারানী ভিক্টোরিয়ার শাসন ব্যবস্থা চালু হবার কিছুকালের মধ্যেই ছোটলাটের ব্যক্তিগত সুপারিশে ও আগ্রহে কামিনীরঞ্জন বিহার ও উত্তরপ্রদেশে বিশাল জমিদারীও লাভ করেন। একদা অশ্ব ও গো-ডাক বিভাগের নগণ্য কর্মচারীর সৌভাগ্যের ইতিহাস এখানেও শেষ হল না।

মহারানী ভিক্টোরিয়ার শাসনব্যবস্থা চালু হলে কিছু ইংরেজ অফিসারকে দেশে পাঠান হল, নতুন কিছু অফিসার দেশ থেকে এখানে এলেন। আবার বেশ কিছু উচ্চপদস্থ অফিসারকে কম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে বদলী করা হল। এই রদবদলের বাজারে ল্যাঙ্কাশায়ার ফিফথ্ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেণ্টের ক্যাপ্টেন বার্জম্যানকে এলাহাবাদে কমিশনার নিয়োগ করা হল। কোন অজ্ঞাত কারণে বহু ইংরেজ অফিসারই এই নিয়োগের খবর জেনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন এবং তারা অনেকেই ওঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎও করতেন না। এই সব ইংরেজদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বহু গণ্যমান্য ভারতীয়রাও বার্জম্যানকে এড়িয়ে চলতেন কিন্তু ব্যতিক্রম ছিলেন শুধু কামিনীরঞ্জন।

কামিনীরঞ্জন নতুন কমিশনার সাহেব ও মেমসাহেবের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দের জন্য প্রাণ ঢেলে দিলেন ও দু-হাতে জলের মত অর্থ ব্যয় করতেন। ক্যাপ্টেন বার্জম্যান সর্বশক্তিমান কমিশনার হলেও লাটসাহেব ছিলেন না, কিন্তু প্রভুভক্ত কামিনীরঞ্জন ওঁকে খুশি করার জন্য সব সময় হিজ একসেলেনসী বলে সম্বোধন করতেন।

বন্ধু কুমুদবিহারী একদিন বললেন, কামিনীরঞ্জন, এতগুলো ইংরেজ অফিসারকে চটিয়ে নতুন কমিশনার সাহেবকে খুশি করা কী বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে?

কামিনীরঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, দেখ কুমুদবিহারী, আমি কমিশনার সাহেবকে নিয়োগ করিনি। স্বয়ং মহারানী ভিক্টোরিয়া ওঁকে এখানে পাঠিয়েছেন। যিনি পৃথিবীব্যাপী এতবড় সাম্রাজ্য চালাচ্ছেন, আমি কি করে তাঁর মনোনীত নতুন কমিশনার বাহাদুরকে সম্মান ও মর্যাদা না দিয়ে পারি।

তা ঠিক কিন্তু···

ওঁকে বাধা দিয়ে কামিনীরঞ্জন বললেন, তাছাড়া কে বলতে পারে, কমিশনার সাহেব স্বয়ং মহারানীর প্রিয়পাত্র বা আত্মীয় না।

কুমুদবিহারীও রাজভক্ত এবং রাজ অনুগ্রহেই জীবনে বহু উন্নতি করেছেন কিন্তু ওঁর মাথায়ও এত কিছু চিন্তাভাবনা আসেনি। উনি গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ে বললেন, তা তো বটেই।

এবার কামিনীরঞ্জন একটু হেসেই বলেন, দেখ কুমুদবিহারী, হু এভার ম্যারেজ মাই মাদার, ইজ মাই ফাদার! যিনিই মাকে বিয়ে করবেন, তিনিই আমার বাবা।

ওঁর কথায় কুমুদবিহারী হোহো করে হেসে ওঠেন। বলেন, ইউ আর রাইট, মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড! ইউ আর রাইট, মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড! ত্রিবেণী সঙ্গম দিয়ে গঙ্গা-যমুনার জল আরো গড়িয়ে যায়। কমিশনার সাহেব ও তাঁর মেমসাহেবের সঙ্গে কামিনীরঞ্জনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ধীরে ধীরে গভীর হৃদ্যতা ও বন্ধুত্বে পরিণত হয়। কামিনীরঞ্জন বুঝতে পারেন, কমিশনার সাহেব শুধু ক্ষমতা পেয়ে খুশি না। উনি আরও অনেক কিছু আশা করেন। প্রভুভক্ত জমিদারও তাঁর সে সুপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে কোন ত্রুটি করেন না। যখন তখন সাহেব-মেম-সাহেবকে দামী দামী জিনিসপত্র উপহার দেন। তারপর সাহেবের জন্মদিনে উনি ওঁকে একটা অত্যন্ত দামী হীরার আংটি দিতেই মেম-সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, খামিনী, আমি কী অপরাধ করলাম যে তুমি বার্জ-কেই শুধু উপহার দিলে?

কামিনীরঞ্জন গদ্‌গদ হয়ে হাসি মুখে বললেন, হিজ একসেলেনসী দয়া করে অনুমতি দিলে আমি আপনাকে হীরের নেকলেস উপহার দেব।

ও ! লাভলি ! শুনেই মেমসাহেব আত্মহারা হয়ে যান।

আধ গেলাস হুইস্কী একসঙ্গে গলায় ঢেলে দিয়ে কমিশনার সাহেব বললেন, খামিনী, তুমি শুধু আমার বন্ধু না, আমার স্ত্রীরও বন্ধু।···

ইওর একসেলেনসী, আমি কী আপনাদের বন্ধু হাবার যোগ্য ? আমি নিছক ভক্ত মাত্র !

একে হুইস্কী, তার উপর অত দামী হীরের আংটি। বার্জম্যান ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বললেন, নো খামিনী, তুমি আমাদের দুজনেরই বন্ধু।

পেটে আরও দু-পাঁচ পেগ হুইস্কী পড়ার পর কমিশনার গড় গড় করে বলে যান, ইউ সী খামিনী, আমি বোকা না···

ছি, ছি, ইওর একসেলেনসী, এ কি কথা বলছেন ?

···হার ম্যাজেস্টি দ্য কুইন আমাকে ভাল না বাসলে এই সাঁইত্রিশ বছর বয়সে আমি কমিশনার হই না কিন্তু আমি জানি অনেকেই আমাকে পছন্দ করে না। এমন কি বহু ব্লাডি নেটিভ জেণ্টলম্যানও আমাকে এড়িয়ে চলে।···

ইওর একসেলেনসী, ওরা পাপী, ওরা হতচ্ছাড়া।

কমিশনার সাহেব ওর কথা শুনেও শোনেন না। উনি আপনমনে বলেন, তুমি যেভাবে আমাদের সেবা করছ, তার জন্য আমরা শুধু খুশি না, উই আর গ্রেটফুল।

এটা তো আমার কর্তব্য ইওর একসে···

হঠাৎ বার্জম্যান গর্জে ওঠেন, স্টপ ! ব্লাডি খামিনী ! কাম অন ! আমরা তিনজনে নাচব !

কামিনীরঞ্জনের জীবনে সে এক অবিস্মরণীয় দিন। পুণ্য তিথিও বলা চলে।

তিনজনে মিলে নাচ শুরু হলেও নেশার ঘোরে কয়েক মিনিটের মধ্যেই বার্জম্যান ঢলে পড়লেন কিন্তু মেমসাহেব কামিনীরঞ্জনকে নিয়ে নাচ থামালেন না। কিছুতেই না। মাঝে মাঝে মেমসাহেব ওয়াইনের গেলাসে চুমুক দেন। কামিনীরঞ্জনও একটু হুইস্কী দিয়ে শুকনো

গলা ভিজিয়ে নেন। নাচ চলে মৃদুমন্দ গতিতে। নাচতে নাচতে কথাও হয়।

জানো খামিনী, বার্জ কী বলে?

কী বলেন?

বার্জ বলে, খামিনী নেটিভ হলেও বোধহয় ইংরেজ মহিলার গর্ভে জন্মেছে। তা না হলে এত সুন্দর দেখতে হয়?

কামিনীরঞ্জনের মনে খুশি ও গর্বের বন্যা বয়ে যায়। বলেন, হিজ একসেলেনসী, আমাকে সত্যি স্নেহ করেন।

আই অলসো লাভ ইউ খামিনী!

একশ'বার! হাজার বার তা স্বীকার করি।

রাত আরো একটু গভীর হয়। বার্জম্যান সাহেব মুহূর্তের জন্য আত্মসম্বিৎ ফিরে পেয়েই আবার একটু হুইস্কী খেয়েই শুয়ে পড়েন। চোখ বন্ধ করেই উনি জড়িয়ে জড়িয়ে বলেন, নাচ থামালেই আমি তোমাদের চাকরি খেয়ে দেব।

গভীর রাত্রি ও ওয়াইন'এর সম্মিলিত মাদকতার প্রভাবে মেমসাহেবও কেমন যেন একটু বদলে যান। কামিনীরঞ্জনকে আরো কাছে টেনে নেন। তারপর হঠাৎ একটি চুম্বন।

কামিনীরঞ্জন চমকে ওঠেন। আনন্দে, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলেন, মেমসাহেব, একি করলেন?

খামিনী, ইউ আর এ লাভলি ম্যান! তোমার সঙ্গে নাচতে আমার খুব ভাল লাগছে।

বাট হিজ একসেলেনসী···

ড্যাম ইওর হিজ একসেলেনসী! ও যদি জনস্টোনের ঐ হতভাগী বউটাকে নিয়ে রেগুলার ফুর্তি করতে পারে, তাহলে আমি তোমাকে কেন কিস করতে পারব না?

মেমসাহেবের কথা শুনেও ওর ভাল লাগে। সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়, কিন্তু হিজ একসেলেনসীর সামনে···।

মেমসাহেব এবার ওকে দু'হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে আবার একটি চুম্বন করেন।

এবার আর কামিনীরঞ্জন চুপ করে থাকতে পারেন না। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলেন, মেমসাহেব, হিজ একসেলেনসী আমাকে গুলী করে মারবেন।

মিসেস বার্জম্যান হাসতে হাসতে বলেন, এখন আমি তোমাকে নিয়ে সারা রাত শুয়ে থাকলেও তোমার হিজ একসেলেনসী জানতে পারবে না। ভুলে যেও না, প্রায় দুবোতল হুইস্কী ওর পেটে গেছে।

দিন এগিয়ে চলে। কমিশনার দম্পতির সঙ্গে কামিনীরঞ্জনের সম্পর্ক আরো নিবিড় হয়। কমিশনার সাহেব ট্যুরে যাবার সময় মাঝে মাঝে স্ত্রীকে ছাড়াও কামিনীরঞ্জনকেও সঙ্গে নিয়ে যান। আবার সাহেব একলা গেলে কামিনীরঞ্জন সকাল সন্ধ্যেয় কোঠীতে গিয়ে মেমসাহেবের তদারকী করেন।

এখন আর বার্জম্যান সাহেবকে কেউ এড়িয়ে চলেন না। বরং সবাই ওকে খুশি করতে ব্যস্ত। রাজা-মহারাজা-জমিদাররা ছাড়াও গণ্যমান্য নেটিভরা ওকে নিত্য উপঢৌকন পাঠান। হাজার-হাজার লাখ-লাখ মূল্যের সেসব উপহার। সাহেব-মেমসাহেব দুইজনেই খুশি কিন্তু দুইজনেই কামিনীরঞ্জনকে বলেন, এখন সবাই আমাদের খুশি করতে ব্যস্ত কিন্তু আমরা জানি তুমি ছাড়া আর কেউ আমাদের রিয়েল ফ্রেণ্ড না।

হিজ একসেলেনসী, আমি কী এই দুর্লভ সম্মানের উপযুক্ত ?

রাজকার্যের জন্য কমিশনার সাহেবকে মাঝে মাঝেই বাইরে যেতে হয়। কখনো দু'একদিন, কখনো আবার পাঁচ-সাতদিন। এই অবসরে মেমসাহেবের সঙ্গে কামিনীরঞ্জনের সম্পর্ক হঠাৎ মোড় ঘুরল।

সেদিন সন্ধ্যে থেকেই দারুণ জল-ঝড়। কামিনীরঞ্জন ঐ জল-ঝড় উপেক্ষা করেই মেমসাহেবের খোঁজ-খবর নিতে এলেন কোঠীতে। ইচ্ছা ছিল ঘণ্টাখানেক থেকেই ফিরে যাবেন কিন্তু ঝড়-বৃষ্টির বেগ এত বাড়ল যে ঘর থেকে বের হওয়াই অসম্ভব। এইসব চিন্তা-ভাবনা করতে

করতেই দুজনে একটু-আধটু ড্রিঙ্ক করলেন। তারপর ঝড়-বৃষ্টির তেজ আরও বাড়তেই মেমসাহেব বললেন, খামিনী, এই ঝড়-বৃষ্টির রাত্রে আমি শুধু চাকর-বাকরদের ভরসায় থাকতে পারব না। আজ তুমি আমার কাছে থাকবে।

না, না, মেমসাহেব তা হতে পারে না। আপনি প্লীজ...

হোয়াট না? না? তুমি আজ আমার কাছে থাকবে। এটা আমার অর্ডার।

মনে মনে যত ইচ্ছাই থাক, মুখে কামিনীরঞ্জন বার বার আপত্তি করলেন। অনুনয়-বিনয়ও করলেন কিন্তু কে কার কথা শোনে? আরও খানিকটা ড্রিঙ্ক করার পর মেমসাহেব কামিনীরঞ্জনকে নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকলেন।

না, এখানেও কামিনীরঞ্জনের জীবন-নাট্যে যবনিকা পড়ল না। বছরখানেক পর হঠাৎ একদিন কমিশনার সাহেব গোপনে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে জনস্টোন সাহেবের সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে উধাও হয়ে গেলেন। পরে অবশ্য জানা গেল, ওরা দুজনে মিশরে গেছেন।

কমিশনার সাহেবের উধাও হবার খবরে কামিনীরঞ্জন প্রথমে ঘাবড়ে গেলেও মেমসাহেব বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। মেমসাহেব ওকে বললেন, খামিনী, অযোধ্যার নবাব বিন্ধ্যাচল পাহাড়ের যে ছোট্ট প্যালেসটা আমাকে দিয়েছেন, আমি সেখানেই থাকব। তুমি আমার সব বিধিব্যবস্থা করে দাও।

শুধু মেমসাহেবের না কামিনীরঞ্জনেরও জীবনে নতুন অধ্যায় শুরু হল। মেমসাহেব বছরের অনেক সময়ই বিন্ধ্যাচলের প্যালেসে কাটালেও রাজা-মহারাজা-নবাবদের প্রদত্ত অন্যান্য কোঠীতেও মাঝে মাঝে কিছুদিন কাটান। কামিনীরঞ্জন জমিদারী দেখাশুনার অজুহাতে মাঝে মাঝেই মেমসাহেবের কাছে কিছুদিন কাটান।

সত্যি বলছি খামিনী, ইংরেজরা ভালবাসতে জানে না। তুমি আমার হাজব্যাণ্ড না কিন্তু তোমার কাছে আমি যে ভালবাসা, যে আদর পাই তা কোন ইংরেজ স্বামী দিতে পারবে না।

সত্যি মেমসাহেব ?

হ্যাঁ খামিনী। মেমসাহেব কামিনীরঞ্জনের গলা জড়িয়ে ধরে বলেন, খাজুরাহো টেম্পল দেখেই আমি বুঝেছি, ইণ্ডিয়ান নেটিভরা সত্যি ভালবাসতে জানে।

দুরন্ত প্রাণচঞ্চল পাহাড়ী নদীর মত কামিনীরঞ্জনের জীবনধারাও বার বার তার গতিপথ বদলেছে। বছর দুই পর এক বান্ধবীর সঙ্গে ডালহৌসী পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে এক দুর্ঘটনায় মেমসাহেব মারা গেলেন।

মেমসাহেবের অকস্মাৎ মৃত্যু কামিনীরঞ্জনের ব্যক্তিগত জীবনে যত দুঃখ বা বেদনার কারণই হোক, লাভও কম হল না। মেমসাহেবের কয়েক লক্ষ টাকার গহনা ও হীরা-জহরত ছাড়াও নানা জায়গায় চার-পাঁচটি প্যালেস ও কোঠী ওরই দখলে এল।

বিহারের গঙ্গাতীরের অর্ধখ্যাত শহরের রাজাবাবুদের পরিবারের এই হল আদি ইতিহাস। তবে এইসব কাহিনী মহেন্দ্রবাবুরা কাউকে বলেন না। বলতে পারেন না। উনি যে সাতটি প্যালেসের জন্য গর্ব করেন, তার অধিকাংশই যে বার্জমান সাহেবের ছিল এবং তাঁর মেমসাহেবের সঙ্গে ওর পূর্বপুরুষের অবৈধ সম্পর্কের জন্যই ওদের দখলে আসে, সে কথা কী কাউকে বলা যায়। বলা যায় না আরও অনেক কিছু।

অধিকাংশ অভিজাত পরিবারের মানুষজনই আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে অতীত ঐতিহ্যের দীর্ঘ কাহিনী না বলে থাকতে পারেন না কিন্তু যা বলেন না, বলতে পারেন না, সে ইতিহাস কাহিনী বোধ হয় আরও দীর্ঘ, আরও রহস্যপূর্ণ।

॥ চার ॥

ইংরেজ প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র উত্তর ভারতে যে অসংখ্য বাঙালী ছড়িয়ে পড়েন, তাঁরা সবাই কামিনীরঞ্জন ছিলেন না। পেশোয়ার-রাওলপিণ্ডি থেকে গিরিডি-জসিডি-মধুপুর বা রাঁচী

জামসেদপুরের স্কুল-কলেজ-লাইব্রেরী, মঠ-মন্দির, সংবাদপত্র-সাহিত্য সভা ইত্যাদির ইতিহাস একটু ঘাঁটঘাঁটি করলেই অসংখ্য উদার শিক্ষিত পরোপকারী বাঙালীর আশ্চর্য কীর্তি-কাহিনী জানা যাবে। বাঙালী শুধু কালীমন্দির দুর্গাবাড়ি বা থিয়েটারের ক্লাব গড়েনি বলেই আজো তারা বহু শহরে-নগরে শ্রদ্ধার আসনে আছেন।

গঙ্গাধর-কামিনীরঞ্জন বা তাদের বংশধরদের রক্তে রাজভক্তির মহা-শক্তিশালী বীজ প্রায় কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মত স্থায়ী আসন বিছিয়ে বসায় শিক্ষা-দীক্ষা বা পরোপকারের বিষ ঢুকতে পারেনি। একমাত্র ব্যতিক্রম রাজা অবলাকান্ত। উনি বোধ হয় ভুল করেই গর্ভধারিণীর স্মৃতিতে একটা স্কুল তৈরি করেছিলেন। অবশ্য তারও কারণ ছিল।

কামিনীরঞ্জন 'হু এভার ম্যারেজ মাই মাদার, ইজ মাই ফাদার' নীতি নিয়ে রাজার জাত ইংরেজদের ভজনায় এমনই নিমগ্ন ছিলেন যে ছেলেমেয়েদের ভদ্র-শিক্ষিত করার চেষ্টায় সারা জীবনে এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করতে পারেনি। তা ই তো তাঁর মৃত্যুর পর ছেলেমেয়েদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি শুরু হতে একটুও দেরি হল না। মামলা-মোকদ্দমাও চলল বেশ কয়েক বছর। তারপর শুরু হল ভাগভাগি-কাড়াকাড়ি। যাই হোক শেষ পর্যন্ত কামিনীরঞ্জনের ঐশ্বর্যের এক ভগ্নাংশ নিয়ে অবলাকান্ত একদিন বিহারের এই শহরে এসে হাজির। সম্বল বলতে শ'দেড়েক একর চাষের জমি, একটা পুরনো কুঠীবাড়ি, কয়েক লাখ টাকার বাসন-কোসন, গহনাগাটি ও প্রায় লাখখানেক টাকার কোম্পানির কাগজ। এই সামান্য সম্বল নিয়ে গঙ্গাতীরের এই ছোট্ট শহরে মোটামুটি শান্তিতে জীবন কাটাবার আশায় উনি এখানে এলেন।

ছোট হলেও শহরটি মন্দ নয়। কলকারখানা তো দূরের কথা, কোন বড় সরকারী অফিসও এখানে নেই। তবে কোর্ট-কাছারি ও কালেক্টর আছেন। কয়েক বছর আগে একটা সরকারী হাসপাতালও হয়েছে। আশেপাশের জমিতে চাষ-আবাদ ভালই হয়। এছাড়া সর্বোপরি বহু

ব্রাহ্মণের বাস। ঠিক জমিদার কেউ না থাকলেও কয়েক ঘর ধনী বারেন্দ্র আছেন। তার মধ্যে ওকালতি করে যতীন মুখুজ্যে ইতিমধ্যেই দুটি দোতলা ও তিন-চারটি একতলা বাড়ি বানিয়েছেন। তাছাড়া উনি জুড়িগাড়ি চড়ে কোর্টে যান। বাঙালীটোলার কালীমন্দির তৈরির জন্য উনি পাঁচশ' এক টাকা দান করে বাঙালী সমাজের সর্বজনস্বীকৃত নেতা বলে বিবেচিত হন। এছাড়া ডাঃ নগেন্দ্রবিজয় বাঙ্গালী ঘোড়ায় চড়ে রুগী দেখতে যান ও নগদ দু'টাকা ফী পান বলেও কম সম্মানিত না। এমনি আরও কয়েকজন আছেন।

এদের সবাইকে টেক্কা দেওয়া ছাড়াও সারা শহরের মানুষকে চমকে দেবার জন্য অবলাকান্ত পুরনো কুঠীবাড়িটাকে একটা প্রাসাদে রূপান্তরিত করতে কলকাতা থেকে সিমেন্ট-লোহালক্কড় ছাড়াও ইটালি থেকে মার্বেল ও জয়পুর থেকে মিস্ত্রী-কারিগর আনলেন। গৃহপ্রবেশের আগে অবলাকান্ত নিজে শহরের প্রত্যেকটি বাঙালীর বাড়িতে গিয়ে করজোড়ে নিবেদন করলেন, আমি একজন দীনদরিদ্র ব্রাহ্মণ। প্রয়াগ থেকে নতুন এসেছি এবং আপনাদের এই শহরে স্থায়িভাবে বস-বাসের অভিপ্রায়ে কোন মতে দিন কাটাবার মত একটা কুটির বানিয়েছি। গৃহপ্রবেশের দিন আপনারা দয়া করে সপরিবারে সবান্ধবে পায়ের ধুলো দিলে কৃতার্থ বোধ করব।

সারা শহরের সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিমধ্যেই রটে গিয়েছিল, এলাহাবাদের রাজার কোঠী তৈরী হচ্ছে। বাঙালীটোলার বাঙালীরা অবশ্য জানতেন না, এলাহাবাদের রাজার বাড়ি না, অবলাকান্ত বাঁড়ুজ্যে বলে কোন এক জমিদার এ বাড়ি তৈরি করছেন। জমিদার না হলে কেউ ইটালি থেকে মার্বেল পাথর আনাতে পারে।

যাইহোক গৃহপ্রবেশের নিমন্ত্রণ পর্ব শেষ হতে না হতেই বাঙালী-টোলার ঘরে ঘরে অবলাকান্তকে নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হল। কেউ কেউ বললেন, জমিদার হলেও লোকটি বেশ বিনয়ী। আবার কেউ কেউ বললেন, নতুন এসেছেন তো! তাই সমাজে ঢোকার চেষ্টা করছেন। আবার দু-চারজন বলাবলি করলেন যে এই

উপলক্ষে সবাইকে দেখিয়ে দেবেন, কত বড় জমিদার। তবে সবাই ঠিক করলেন, নিমন্ত্রণ রক্ষা করতেই হবে। হাজার হোক জমিদার। তারপর বাড়ি এসে যখন নেমন্তন্ন করেছেন তখন না যাওয়া অত্যন্ত অন্যায় ও অসামাজিক কাজ হবে।

শহরের ধারের গঙ্গার মত এখানকার বাঙালী সমাজেও জোয়ার-ভাটা হতো না। গতানুগতিকভাবেই তাদের দিন কাটছিল। যতীন মুখুজ্যে ও নগেন গাঙ্গুলীর মত কয়েকজন মাত্র উপলব্ধি করলেন, অবলাকান্ত ওদের শান্তিতে থাকতে দেবেন না।

গৃহপ্রবেশের দিন দুপুরের মধ্যে বাঙালীটোলার ঘরে ঘরে রটে গেল, গৃহ প্রবেশের পূজা করার জন্য অবলাকান্ত পুরুতঠাকুরকে একশ' টাকা দক্ষিণা, রুপোর বাসন-কোসন ও বহু কাপড়-চোপড় ছাড়াও দশ বিঘে জমি দান করেছেন। কোর্ট থেকে ফিরে এসে গিন্নীর কাছে এই সংবাদ শুনেই যতীন মুখুজ্যে বললেন, বুঝলে গিন্নী, এ হারামজাদা আমার মত দু-একজনকে অপমান করার জন্যই এইসব বদমায়েসী শুরু করেছে।

গিন্নী পান চিবুতে চিবুতে বললেন, সরলা পিসীর কাছে খবরটা শুনে আমি তো ভাবলাম, জমিদার হলেও লোকটা বড় ধাম্মিক।

ঘোড়ার ডিম ধার্মিক! শালা টাকার গরম দেখাচ্ছে।

গিন্নী রাঁধুনী-মার হাত থেকে লুচি-হালুয়ার পাত্র নিয়ে স্বামীর সামনে রেখেই বললেন, তাহলে আমরা আর ওর রাজবাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছি না।

না, না, গিন্নী যেতে আমাদের হবেই।

যে তোমাকে অপমান করতে চায়, তার বাড়িতে যাব কেন?

যতীন উকিল একটু হেসে গিন্নীর দিকে তাকিয়ে বলেন, তুমি তো চাণক্য শ্লোক পড়নি। পড়লে জানতে যুদ্ধ জয় করতে হলে আগে শত্রু সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ভিতরের সব খবর জেনে নিতে হয়। আমরা শুধু আজই যাব না, নিয়মিত যাতয়াত করব।

অবলাকান্ত সত্যি এলাহি ব্যাপার করেছিলেন। গেটের কাছেই

সব অতিথি-অভ্যাগতদের মাথায় আতর জল ছিটিয়ে দেওয়া হল। কর-জোড়ে অভ্যর্থনা করলেন স্বয়ং অবলাকান্ত। পারস্য দেশীয় কার্পেটের উপর দিয়ে হেঁটে অতিথিরা প্যালেসের সামনে পৌঁছতেই তাদের প্রত্যেকের গলায় মালা, হাতে গোলাপফুল দেওয়া হল। ওদিকে কাশীর ওস্তাদ নাসিরুদ্দীন খাঁ সাহেব বিভোর হয়ে সানাই বাজাচ্ছিলেন। ইটালিয়ান মার্বেল দিয়ে মোড়া সিঁড়ি পার হয়ে দোতলার মেন ড্রইং রুমে পুরুষ অতিথিরা না ঢুকতে ঢুকতেই সবার হাতে এক গ্লাস করে চন্দনের শরবত তুলে দেওয়া হল। বাঙালীটোলার বাসিন্দারা ঘরদোর সাজসজ্জা দেখে সত্যি বিস্মিত না হয়ে পারেন না। সবাই ফিসফিস করে বলাবলি করেন, লোকটার যেমন পয়সা তেমন রুচি আছে। ইতিমধ্যে হঠাৎ স্বয়ং কালেক্টর সাহেব মেমসাহেবকে নিয়ে হাজির হতেই বাঙালীটোলার সবাই যেন ভূত দেখার মত চমকে ওঠেন। এমন কি যতীন উকিল ও নগেন ডাক্তারও স্বপ্নে ভাবেননি কালেক্টর সাহেব মেমসাহেবকে নিয়ে এই সদ্য আগত অবলাকান্তর বাড়িতে গৃহপ্রবেশের নেমন্তন্ন খেতে আসবেন। তাছাড়া এ শহরে কোন বাঙালীর বাড়িতে ইতিপূর্বে কোন কালেক্টর সাহেবের শুভাগমন হয়নি। আমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত ধনী বাঙালীরাও বিস্মিত হলেন।

সেদিনের আমন্ত্রিত বাঙালী সজ্জনদের বিস্ময়ের পর্ব এখানেও শেষ হল না। কালেক্টর সাহেবের বিদায় লগ্নের পূর্ব মুহূর্তে অবলাকান্ত জন-কল্যাণে ব্যয় করার জন্য মেমসাহেবের হাতে পাঁচ হাজার এক টাকা দান করলেন। সমস্ত বাঙালীর সামনে কালেক্টর সাহেব বললেন অবলাকান্তর মত দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ প্রজার জন্য আমরা সত্যি গর্বিত।

বাড়িতে ফেরার পর যতীন উকিলের স্ত্রী বললেন, গল্পের বইতেই রাজবাড়ির কথা পড়েছি কিন্তু আজ সত্যি একটা রাজবাড়ি দেখলাম। লোকটার যে কত কোটি টাকা আছে, তা কে জানে।

উকিলবাবু গম্ভীর হয়ে কথাগুলো শুনে শুধু বললেন, হুঁ।

তবে লোকটার দিল আছে। তা না হলে শুধু গৃহপ্রবেশের জন্য এত টাকা ব্যয় করতে পারে।

এবার উকিলবাবুর মুখ দিয়ে আর একটি শব্দও বেরোয় না কিন্তু ওর গিন্নী চুপ করে থাকতে পারেন না। বলেন, আমাদের এই বাঙালী-টোলা কালীমন্দিরের জন্য দু-আড়াই হাজার টাকা তুলতেই সবাই হিমসিম খেয়ে গেল। তুমি পাঁচশ টাকা না দিলে তো মন্দিরটাও শেষ হত না আর এই অবলা বাঁড়ুজ্যে দুম করে পাঁচ হাজার টাকা মেমসাহেবের হাতে তুলে দিল!

এবারও উকিলবাবু চুপ। কী বলবেন?

শুধু যতীন মুখুজ্যের বাড়িতেই না বাঙালীটোলার ঘরে ঘরেই অবলাকান্তকে নিয়ে আলোচনা শুরু হল। সবাই স্বীকার করলেন, লোকটা সত্যি রাজা। রাজা না হলে ঐ রকম প্রাসাদ বানাতে পারে? নাকি অমন মুড়ি-মুড়কির মত টাকা খরচ করতে পারে? সেদিন দুপুরে অবনী চাটুজ্যেদের বাড়ির পাঁচ বউ শুয়ে শুয়ে অবলাকান্তকে নিয়েই আলোচনা করছিলেন। বাড়ির বড় বউ অবনী-গিন্নী বললেন, অবলাকান্তর স্ত্রীকে দেখতে সত্যি রানীর মত। এই বয়সেও কী রূপ! চোখ ঝলসে যায়?

সেজ বউ বললেন, তাছাড়া বড়দি, উনি কত হীরের গহনা পরে ছিলেন, তা দেখেছো?

মেজ বউ একটু হেসে বললেন, আজ ওকে দেখে যতীন উকিলের বউয়ের দেমাক ঠাণ্ডা হয়েছে।

বড় বউ বললেন, আমি খুব খুশি। যতীন উকিলের বউয়ের এত অহঙ্কার আর সহ্য করা যাচ্ছিল না।

ছোট বউ বললেন, বড়দি, শুধু ওর কথা কেন বলছ? ডাক্তার-বাবুর স্ত্রীর অহঙ্কার কী কম?

আবার একটা পান মুখে পুরে মেজ বউ বললেন, এবার সব ঠাণ্ডা। নন্দ ঠাকুরপোর ছেলের অন্নপ্রাশনে আমি গরদ পরে যাইনি বলে

ডাক্তারের বউ আমাকে সবার সামনে যে অপমান করেছিল, তা কী আমি জীবনে ভুলব ?

বড় বউ বললেন, ঐ উকিল আর ডাক্তারের বউ—দুটোই সমান। সব সময় দেখাতে চায় ওদের অনেক টাকা আছে। আর এখন ? অবলা বাড়ুজ্যে তো ওদের মত লোককে চাকর রাখতে পারে।

দু-তিন বউ একসঙ্গে বলে, ঠিক বলেছ !

শুধু মেয়েদের মধ্যে না, বাঙালীটোলার পুরুষদের মধ্যেও এখন একমাত্র আলোচনার বিষয় রাজা অবলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকখানায়, তাসের আড্ডায়, ব্যায়ম সমিতির মাঠে, কালীমন্দিরের চত্বরে—যেখানেই দু-চারজন বাঙালী বাবুদের দেখা হয়, সেখানেই ঐ এক কথা, আলোচনা। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কিন্তু মাস ঘুরতে ঘুরতেই বাঙালীদের আলোচনায় নতুন মোড় ঘুরল।

সেদিন কী কারণে যেন কোর্ট-কাছারির ছুটি। স্কুল-টুলও বন্ধ। কর্তা ব্যক্তিরা সবাই বাড়িতে আছেন বা ইতিমধ্যে পাড়ার সমস্ত বাচ্চা-কাচ্চার সম্মিলিত চিৎকার—মোটরগাড়ি ! মোটরগাড়ি !

মোটরগাড়ি ? বাঙালীটোলায় ? ছেলেমেয়েরা বলে কী ? এ শহরে শুধু কালেক্টর সাহেবের মোটরগাড়ি আছে। তাও তিনি নিয়মিত ব্যবহার করেন না। কদাচিৎ, কখনও। তবে ছোটলাট মাঝে মাঝে আসেন বলে কালেক্টর সাহেবকে এই মোটরগাড়ি দেওয়া হয়েছে। ছেলেমেয়েদের চিৎকার শুনে বুড়ো-বুড়ীরাও চুপ করে বসে থাকতে পারেন না। বাইরে বেরিয়ে না এলেও ওরা সবাই জানলা দিয়ে উঁকি দিলেন। না দিয়ে পারলেন না। হ্যাঁ সত্যি তো একটা মোটরগাড়ি ঐ মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। তবে কী কালেক্টর সাহেব এলেন ? কিন্তু বাঙালীটোলায়···

দাহু ! দাহু ! রাজবাড়ির মোটরগাড়ি।

কী বললি ?

রাজবাড়ি থেকে মোটরগাড়ি এসেছে

তুই কী করে জানলি ?

আমি শুনলাম।

প্রথমে বুড়ো-বুড়ীরা বিশ্বাস করেননি কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেখা গেল, ওরা ঠিকই বলেছে। আগামী শনিবার সন্ধ্যায় রাজবাড়িতে শনি-সত্যনারায়ণ পূজা হবে। তাই স্বয়ং অবলাকান্তর স্ত্রী বাড়ি বাড়ি নেমন্তন্ন করতে বেরিয়েছেন।

গড়গড়ার নল পাশে সরিয়ে রেখে যতীন মুখুজ্যে ওর স্ত্রীকে বললেন, বুঝলে গিন্নী, অবলাকান্ত এক ঢিলে দুই পাখি মারল। শনি-সত্যনারায়ণের নেমন্তন্ন করাও হল, আবার নতুন মোটরগাড়িটাও বাঙালীটোলার সবাইকে দেখিয়ে গেলেন।

তা ঠিক কিন্তু মোটরগাড়িটা ভারী সুন্দর!

উকিলবাবু চুপ।

তাছাড়া যে লোকটা গোল চাকার মত কি একটা ধরে চালাচ্ছিল, সে কী সুন্দর জামা-কাপড় পরেছিল!

এবারও উকিলবাবু চুপ।

গিন্নী কিন্তু চুপ করে থাকতে পারেন না। স্বামীকে জিজ্ঞেস করেন, হ্যাগো-একটা মোটরগাড়ি কিনতে কত টাকা লাগে?

হবে দশ-পনের হাজার।

বাপরে বাপ! এত টাকা লাগে? ঐ টাকা দিয়ে তো তুমি দু-তিনটে বাড়ি বানিয়েছ?

এবার উকিলবাবু একটু রেগেই বলেন, আজেবাজে বকবক করা বন্ধ কর তো।

যাইহোক এই ভাবেই অবলাকান্ত তার পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যাকে নিয়ে এই নতুন শহরে জীবন আরম্ভ করলেন।

॥ পাঁচ ॥

মানুষ সুখে-দুঃখে যে ভাবেই থাক, সময় কখনও দাঁড়িয়ে থাকে না। মানুষ অলস কর্মহীন থাকলেও ঘড়ির কাঁটা টিক টিক করে প্রায়

অলক্ষ্যেই এগিয়ে চলে। পচা ভাদ্দরের মেঘে সারা আকাশ ছেয়ে থাকলেও সূর্য ঠিক সময়েই উদয় হয়, অস্ত যায়। শত সহস্র মানুষের তর্জন-গর্জন বা চোখের জলে ফুল ফোটা মুহূর্তের জন্যও বিলম্বিত হয় না। সর্বত্যাগী উদার সন্ন্যাসীর মত সময় ও প্রকৃতি তাদের আপন সাধনায়, লীলাখেলায় মত্ত।

হঠাৎ একদিন অবলাকান্তের খেয়াল হল, প্রয়াগ ত্যাগ করে আসার পর এই শহরে অনেকগুলি বছর কাটিয়ে দিয়েছেন। মন-মেজাজও ইদানীং ভাল যাচ্ছে না। সব সময় ঐ এক চিন্তা, যে খবর ওঁর স্ত্রী বা ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত জানতে পারেনি এবং ড্রাইভার বা দারোয়ান-চাকর-বাকরদের পক্ষেও জানা অসম্ভব, সে খবর বাঙালীটোলায় ছড়িয়ে গেল কী করে? সর্বোপরি এ খবর কালেক্টর সাহেবের কাছে কে বা কারা পৌঁছে দিলেন?

কালেক্টর সাহেব অনুরোধ করলে উনি হাসতে হাসতে স্কুলের জন্য দশ হাজার কেন, বিশ হাজারও দিতে পারতেন কিন্তু এই কেলেঙ্কারী চাপা দেবার জন্য টাকা দিয়েছেন বলেই অবলাকান্তের দুঃখ। মনে বেদনা।

একবার তো উনি ভেবেছিলেন, সবার সামনেই বলবেন, যা করেছি, বেশ করেছি। আমি পুরুষ মানুষ তার উপর জমিদার। এবং স্বাস্থ্যবান ও অত্যন্ত সুদর্শন। সুতরাং যদি কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মহিলা স্বেচ্ছায় তাকে আনন্দদান করেন, তাহলে উনি কেন প্রত্যাখান করবেন?

যাকগে। এসব নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছেন এবং স্কুলের জন্য দশ হাজার টাকা দান করার পর বাঙালীটোলার বাসিন্দাদের ধারণা হয়েছে, সুধাদেবী ও তার হতচ্ছাড়া ডেপুটি স্বামী অবলাকান্তর কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা আত্মসাৎ করার জন্যই এই ধরনের একটা নোংরা গুজব ছড়িয়ে ছিলেন। যাইহোক কালেক্টর সাহেবের অশেষ কৃপায় সব ভাল ভালয় মিটে গেছে। শেষ পর্যন্ত উনি ডেপুটিকেও সাঁওতাল পরগণায় বদলী করে দিয়েছেন। তবুও আর এখানে ভাল লাগছিল না।

কামিনীরঞ্জন মৃত্যুর কয়েক বছর আগে কাশীর বাঙালীটোলায় একটা বিরাট বাড়ি কেনেন এবং এই বাড়িটি কারুরই বিক্রির অধিকার নেই। শুধু বসবাস করার অধিকার আছে সব ছেলেমেয়ে ও তাদের বংশধরদের। তীর্থে গেলে দূর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনরাও এখানে থাকতে পারবেন বলে কামিনীরঞ্জন উইল করে যান। বোধহয় কাশীর এই বাড়ির কথা ভেবেই অবলাকান্তের স্ত্রী বিন্দুবাসিনী দেবী বহুকাল ধরেই বলছিলেন, হ্যাঁগো, মোটরগাড়ি কেনার পর মাঝে মাঝে কয়েক দিনের জন্য দেওঘর-বৈদ্যনাথধাম যাওয়া ছাড়া আর তো কোথাও যাই না। চলো না, কিছুদিনের জন্য কোন তীর্থে ঘুরে আসি।

উনি একটু থেমেই আবার বলেন, এই ছোট্ট শহরে থাকতে থাকতে সত্যি হাঁপিয়ে উঠেছি।

অবলাকান্ত একটু হাসেন।

হাসছ যে? সত্যি, এই ছোট্ট শহরে কী করে যে এক নাগাড়ে এতগুলো বছর কাটিয়ে দিলাম, তা ভাবলেও অবাক হতে হয়।

সত্যি, অনেক বছর আমরা কোথাও যাই না।

বিন্দুবাসিনীদেবী বলেন,এ হতচ্ছাড়া শহরে না আছে একটা মন্দির, না আছে একটা ভাল রাস্তা বা বেড়াবার জায়গা। তাছাড়া অন্নপ্রাশন থেকে বিয়ে-পৈতে-শ্রাদ্ধ যে কোন অনুষ্ঠানেই যাই না কেন, সেই বাঙালীটোলার কয়েকটা পরিচিত মুখ ছাড়া একজন নতুন মানুষের মুখও এখানে দেখতে পাই না।

অবলাকান্ত একটু হেসে বলেন, তুমি ঠিকই বলেছ। এখানে সব উৎসব-অনুষ্ঠানেই একই মানুষগুলোকে সব সময় দেখতে পাওয়া যায়।

এবার বিন্দুবাসিনীদেবী একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, সব চাইতে বড় কথা ছেলেমেয়েদের ঝামেলা আর সহ্য হচ্ছে না। খুব দূরে কোথাও একলা থাকতে পারলেই বোধহয় একটু শান্তিতে থাকতে পারতাম।

অবলাকান্তও দীর্ঘনিঃশ্বাস না ফেলে পারেন না। বলেন, ছুটো

মেয়েকে বিয়ে দেবার পরও যে এত ঝামেলা সহ্য করতে হবে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

তা ঠিক কিন্তু তোমার ছেলেরা যে এক একটি রত্ন তৈরি হয়েছে।

অবলাকান্ত মুখ নিচু করে মাথা নাড়েন, মুখে কিছু বলেন না।

সত্যি, ছেলেমেয়েদের নিয়ে ওদের দুশ্চিন্তার শেষ নেই। এখানে আসার পরই ওঁরা ছেলেমেয়েদের পাদ্রীদের স্কুলে ভর্তি করেন। প্রত্যেক ছেলেমেয়ের জন্যই আলাদা আলাদা গৃহ-শিক্ষক নিয়োগ করলেন কিন্তু কোন ছেলেমেয়েই না নিয়মিত স্কুলে যাবে বা বাড়িতে পড়বে। বড় পাদ্রী নিজে কতবার অবলাকান্তকে বলেছেন, রাজাবাবু, আপনার চিলড্রেনরা বহুত কামাই করে। আই আণ্ডার-স্ট্যাণ্ড ওরা জমিদার বাড়ির ছেলেমেয়ে এবং আমরা ওদের স্পেশালী ট্রিট করি কিন্তু স্কুলের তো কিছু রুলস আছে।

হ্যাঁ ফাদার, আমি তা বুঝি।

আপনি প্লীজ ওদের বলবেন রেগুলারলি স্কুলে যেতে।

নিশ্চয়ই বলব।

থ্যাঙ্ক ইউ রাজাবাবু।

ওরা স্বামী-স্ত্রী বার বার বলেও কোন ফল হয় না। ছেলেমেয়েরা দুদিন স্কুলে গেলে তিনদিন যায় না। ভাগ্যক্রমে স্কুলে গেলেও মাথা ধরা, পেট কামড়ানোর অজুহাতে অনেকেই অনেক দিন পুরো স্কুল করবে না। গৃহ-শিক্ষকরাও সকাল-সন্ধেয় নিয়মিত আসাযাওয়া করেন, চা-জল-খাবার খান কিন্তু তাঁরা অধিকাংশ দিনই ছাত্র-ছাত্রীদের দর্শন পান না।

এইভাবেই বছরের পর বছর কেটেছে। অবলাকান্ত গোপনে গোপনে পাদ্রীদের স্কুলে প্রতি বছর কিছু দানধ্যান করে ছেলেমেয়েদের প্রমোসন ব্যবস্থা করেছেন। কী করবেন? সব ছেলেমেয়ে ফেল করলে ওঁর সম্মান থাকে কোথায়?

মোহনবাগানের শীল্ড জয়ের খবর ছড়িয়ে পড়তেই বড় ছেলে সূর্যকান্ত অবলাকান্তকে বলল, বাবা, বাঙালীদের ক্লাব মোহনবাগান সাহেবদের হারিয়ে শীল্ড জয় করেছে, সে খবর জানেন?

শুনেছিলাম বটে।

আমি কলকাতা যাব।

তার সঙ্গে মোহনবাগানের শীল্ড জয়ের কী সম্পর্ক?

ঠিক করেছি আমিও মোহনবাগানে খেলে সাহেবদের হারাব।

জ্যেষ্ঠপুত্রের কথাবার্তার ধরন দেখেই ওঁর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। বলেন, সাহেবদের হারানো কী খুব মহৎ কাজ? নাকি জমিদারবাড়ির ছেলে হয়ে সাহেবদের বিরুদ্ধে খেলা খুব সম্মানজনক?

মিনিটখানেক চুপ করে থাকার পর সূর্যকান্ত বলে, কিন্তু আমি ফাইনালি ঠিক করেছি মোহনবাগানে খেলব।

অবলাকান্ত পুত্রের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে কী সেই খেলা দেখার নেমন্তন্ন করছ? নাকি আমাকেও খেলতে হবে?

না মানে···

কী বলতে চাও, চটপট বল। আমার অনেক কাজ আছে।

আমাকে টাকা দিতে হবে।

কেন?

টাকা না দিলে ওরা আমাকে খেলতে দেবে কেন?

অবলাকান্ত ভুরু কুঞ্চিত করে বড় কুমারকে জিজ্ঞেস করেন, ফুটবল গোল না চৌকো, তা তুমি জানো?

কী যে বলেন আপনি? ফাদার বারোজকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি কী দারুণ ফুটবল খেলি।

আচ্ছা?

সূর্যকান্ত বেশ গর্বের সঙ্গেই বলে, হ্যাঁ, উনিই তো আমাকে বলেছেন, আমি মোহনবাগানে চান্স পাবই।

অবলাকান্ত একটু মৃদু হেসে বলেন, বাঃ! বড়ই আনন্দের কথা। এবার উনি নিজেকে দেখিয়ে বলেন, তাহলে এই বাঙালী ফাদারকে বিরক্ত না করে তোমার ঐ সাহেব ফাদারকেই বল টাকাকড়ি দিতে। প্রায় এক নিঃশ্বাসেই উনি বলেন, যাও, বিরক্ত কর না।

হাজার হোক কামিনীরঞ্জনের নাতি। যাও বললেই কী চলে যায়? কত ঝগড়া-বিবাদ চিৎকার-চেঁচামেচি জিনিসপত্র ভাঙাচুরো করে শেষ পর্যন্ত সূর্যকান্ত সত্যি সত্যি হাজার হাজার টাকা নিয়ে কলকাতা গেল। কলকাতায় যাবার পরও শান্তি কী আছে? শেষ পর্যন্ত কেচ্ছা কেলেঙ্কারী!

দ্বিতীয় পুত্র চন্দ্রকান্ত বেশ ভদ্র-সভ্য থাকলেও হঠাৎ একদিন তার মাথায় ভূত চাপল, উনি কবি হবেন। কার কাছ থেকে শুনেছিল, রবিবাবু পদ্মার উপর সুন্দর বাহারী নৌকায় বসে কাব্য রচনা করেন। ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে তিনি পিতৃদেবের কাছে আবেদন পেশ করলেন, বাবা, আমিও গঙ্গায় চাঁদনী রাতে বোটে বসে কাব্য রচনা করব।

অবলাকান্ত না হেসে পারলেন না। বললেন, অতি সাধু প্রস্তাব কিন্তু বাবা, চাঁদের আলো তো আমাদের বারান্দায়, বাগানেও ছড়িয়ে পড়ে। সে সব জায়গায় বসে কাব্য রচনা হয় না?

তাহলে আর রবিবাবু জোড়াসাঁকোর প্রাসাদ ছেড়ে পদ্মার বুকে ভেসে বেড়াতেন না।

অকাট্য যুক্তি! লুকিয়ে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করলেন, তা বাবা কতদিন তুমি গঙ্গার বুকে ভেসে বেড়াবে?

যতদিন ভাল লাগে।

বাঃ! কিন্তু বাবা, আকাশে তো সব সময় চাঁদ থাকে না। চাঁদমামা পনেরো দিন ডিউটি দিয়ে পনেরো দিন ছুটিতে থাকেন। তখন তুমি কী করবে?

অত ভাবিনি।

অত না ভাবলে তো তোমাকে আমি রবিবাবু তৈরি করতে পারব না।

এবার ভাবী কবিও ফোঁস করে ওঠে। বলে, এই জমিদারীতে আমারও অংশ আছে।...

না, অবলাকান্ত আর সহ্য করতে পারেন না। দপ করে জ্বলে ওঠেন। বলেন, বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে। গলা টিপলে

দুধ বেরুবে আর এরই মধ্যে উনি জমিদারীর অংশ নিয়ে কথা বলছেন।

ভাবী কবি মুহূর্তের মধ্যে অবলাকান্তের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেলেও কয়েক ঘণ্টা পর স্বয়ং কালেক্টর সাহেবকে নিয়ে ফিরে এল।

ছি, ছি, সে কী কেলেঙ্কারী! বিচক্ষণ কালেক্টর সাহেব পিতা-পুত্র দুজনকেই অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু কোন ফল হল না। শেষ পর্যন্ত নগদ বিশ হাজার টাকা, বেশ কিছু জমিজমার দলিল ও যথেষ্ট গহনাপত্র নিয়েই হবু কবি চন্দ্রকান্ত গৃহত্যাগ করলেন।

এখানেই নাটক শেষ হল না। পরদিন ভোরেই সারা বাঙালী-টোলার ঘরে ঘরে আগুনের মত খবর ছড়িয়ে পড়ল, রাজবাড়ির গৃহ-শিক্ষক আশু লাহিড়ীর মেয়ে লতাকে নিয়ে দ্বিতীয় কুমার সাহেব শহর ছেড়ে উধাও হয়েছে। এ দুঃসংবাদ অবলাকান্তর কানে পৌঁছতেই উনি আশুবাবুকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, যা শুনছি তা কি সত্যি?

আজ্ঞে, আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

ন্যাকামী না করে সোজাসুজি বলুন, আপনার মেয়ে আমার ছেলেকে নিয়ে পালিয়েছে কিনা।

আজ্ঞে না।

আজ্ঞে না মানে? সারা বাঙালীটোলার মানুষ যে কথা জানে আর আপনি···

আশুবাবু নিজে শিক্ষকতা করলেও ওঁদের বংশের সবাই ওকালতি করেন। জমিদার না হলেও প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক ওঁরা। ছোট-খাট যুদ্ধ-বিগ্রহ করার অভ্যাস ভালই আছে। তাই উনি অবলাকান্তকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বললেন, আজ্ঞে বাঙালীটোলায় যে খবর রটেছে, তা ঠিকই কিন্তু আমার মেয়ে আপনার ছেলেকে নিয়ে উধাও হয়নি···

এবার অবলাকান্তর মুখ দিয়ে ইংরাজি গালাগালি বেরোয়, ননসেন্স!

আজ্ঞে আমাকে কথাটা শেষ করতে দিন। আসলে আপনার ছেলেই আমার মেয়েকে নিয়ে উধাও হয়েছে।

অবলাকান্ত অনেক তর্জন-গর্জন করলেও আশুবাবু বিন্দুমাত্র উত্তেজিত হলেন না। অত্যন্ত ধীর-স্থিরভাবে জমিদারবাবুকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ওসব বারেন্দ্র-রাঢ়ী নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করে লাভ নেই।

কেন? কেন?

ওরা আর হিন্দু নেই। ব্রাহ্ম হয়েই ওরা বিয়ে করেছে।

কথাটা শুনেই শান্তকাল বৈশাখীর মত অবলাকান্ত ফেটে পড়লেন কিন্তু হাতের পাখী বনে উড়ে গেলে কী আর ফিরে আসে?

শুধু সূর্যকান্ত ও চন্দ্রকান্তকে নিয়েই অশান্তি না। অন্য তিন পুত্র ইন্দ্রকান্ত, নিশিকান্ত ও শ্রীকান্তকে নিয়েও ওদের স্বামী-স্ত্রীর কম ঝামেলা বা অশান্তি সহ্য করতে হয়নি বা হয় না। এক একটি এক এক অবতার।

সৌখীন ইন্দ্রকান্ত যখন প্রথম সঙ্গীত চর্চায় আত্মমগ্ন হল, তখন বিন্দুবাসিনীই স্বামীকে বললেন, ম্যানেজারবাবু বলছিলেন, ওস্তাদজী বলেছেন, তোমার এই ছেলে গান-বাজনায় খুব নাম করবে।

আগে নাম করুক, তারপর বল। অনেক দুঃখে অবলাকান্ত একটু ম্লান হেসে বললেন, তুমি সত্যি রত্নগর্ভা!

এখন যত দোষ, নন্দ ঘোষ! তাই না? তোমার বাপ-ঠাকুর্দারা কী মহাপুরুষ ছিলেন, তা কী ভুলে গেছ? যে বাড়িতে বসে কথা বলছ, সে বাড়িটাও তো তোমার বাপের মেমসাহেব রক্ষিতার।

আঃ! চুপ কর।

দিন এগিয়ে চলে। বছরের পর বছর ঘুরে যায়। প্রিয় শিষ্যের সঙ্গীত বিদ্যায় অভূতপূর্ব উৎসাহ ও নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে ওস্তাদজী পাত-তাড়ি গুটিয়ে রামপুর ফিরে গেছেন। কুমার ইন্দ্রকান্ত এখন নিজেই ওস্তাদ। বাঙালীটোলার কিছু রসিক ছোকরা তার একান্ত ভক্ত-শিষ্য। রোজ সন্ধ্যেয় আসর বসে, চলে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত। তবে খেয়াল-ঠুংরীর চর্চার চাইতে খামখেয়ালী করেই সময় কাটে। ওস্তাদ-

জীর অনুপ্রেরণায় ও সক্রিয় সাহায্যে শিষ্যরাও একটু-আধটু পান করেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চা করতে হলে ওটা নাকি অত্যন্ত জরুরী। বাঙালীটোলায় শিষ্যদের বাড়িতে বাড়িতে চাপা গুঞ্জন, মৃদু প্রতিবাদ, মাঝে মাঝে অশান্তি কিন্তু কোন ফল হয় না। ওস্তাদজীর চাইতে শিষ্যদেরই বেশি উৎসাহ, উদ্দীপনা। কখনও কখনও ওস্তাদজীও শিষ্যদের বাড়িতে হাজির হয়ে নানা রাগ-রাগিণী নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। শিষ্যদের বাড়ির লোকজনও তাতে খুশি হন। না হবার কোন কারণ নেই। ইন্দ্রকান্ত যে কখনই খালি হাতে শিষ্যদের বাড়ি যান না। কিছু না হলেও এক ঝুড়ি ল্যাংড়া আর দু'আড়াই সের রাজভোগ নিশ্চয়ই নিয়ে যাবেন। সম্ভব হলে আরও অনেক কিছু কিন্তু সেদিন ইন্দ্রকান্ত বৃন্দাবন মুখুজ্যের স্ত্রীর হাতে একখানি সুন্দর গরদের শাড়ি তুলে দিতেই উনি অবাক—একি বাবা? হঠাৎ আমাকে গরদের শাড়ি দিচ্ছ কেন? আপনি তো দিনের অর্ধেক সময় পূজার ঘরেই কাটান! তা···। ইন্দ্রকান্ত অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করে।

কিন্তু তাই বলে এত দামী গরদ?

না, না মাসিমা, এসব কথা বলে লজ্জা দেবেন না। সুধাময়ের মত আমিও তো আপনার এক ছেলে!

আহা হা! কি কথা! বৃন্দাবন-পত্নী আনন্দে গর্বে প্রায় কেঁদে ফেলেন আর কী! বলেন, সে তো একশ' বার বাবা। তোমার মত ছেলে পেটে ধরতে পারলে তো ধন্য হয়ে যেতাম।

শুধু সুধাময়ের মা না, সব শিষ্যের মা-রাই এখন ইন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাভক্তি ও ব্যবহারে মুগ্ধ। ওদের সবার বাড়িতেই ইন্দ্রনাথের অবাধ গতি।

···এই যে শোভা, মুকুন্দ আছে?

এমন অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে শোভা চমকে ওঠে। কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে মুহূর্তের জন্য ইন্দ্রকান্তর দিকে তাকিয়ে বলে, না, দাদা তো নেই।

ইন্দ্রকান্ত একটু গম্ভীর হয়ে কি যেন চিন্তা করে বলে, একটু দরকার ছিল। আচ্ছা···

আপনি চলে যাচ্ছেন ?

হ্যাঁ।

দাঁড়ান, দাঁড়ান, মাকে ডাক দিই।

আবার ওঁকে কষ্ট দেবার কী দরকার? তাছাড়া উনি নিশ্চয়ই কাজকর্মে ব্যস্ত আছেন।

না, না, আপনি বসুন। আমি মাকে ডাকছি। শোভা প্রায় দৌড়ে ভিতরে যায়।

এক মিনেটের মধ্যেই মুকুন্দর মা এসে বলেন, তুমি দাঁড়িয়ে কেন বাবা? আগে বসো।

মুকুন্দ যখন নেই···

সে নেই বলেই তুমি চলে যাবে? আমরা কী কেউ না?

সেই শ্রদ্ধা, বিনয়ের সঙ্গে ইন্দ্রকান্ত বলে, আমি তো তা বলিনি মাসিমা।

একটু মিষ্টিমুখ না করেই তুমি চলে যাবে, তাই কী হয়?

আবার মিষ্টিমুখ···

না না, তুমি বাবা বসো। এবার উনি মেয়েকে বলেন, শোভা, ইন্দ্রকান্তকে বাতাস কর।

উনি সঙ্গে সঙ্গেই ভিতরে চলে যান। শোভা ভিতর থেকে ঝালর দেওয়া একখানা হাত-পাখা এনে বাতাস করতেই ইন্দ্রকান্ত একটু হেসে বলে, না না, হাওয়া করতে হবে না। তুমি বসো।

শোভা মৃদু প্রতিবাদ করে, না না, শুধু শুধু বসে থাকব কেন?

হ্যাঁ, তুমি শুধু শুধুই বসে থাকবে। আমি তোমাকে দেখব।

আনত নয়নে শোভা বলে, আমাকে আবার কী দেখবেন?

কী দেখব মানে? তোমার মত সুন্দরী মেয়ে এ শহরে আর কে আছে?

শুনে আনন্দে গর্বে শোভার বুক ভরে উঠে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লজ্জায় সারা মুখ লাল হয়ে যায়। ওর মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় না।

ইন্দ্রকান্তই আবার কথা বলে, তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে। ইচ্ছে করে তোমার সঙ্গে গল্প করি, তোমাকে গান শেখাই…

আমারও গান খুব ভাল লাগে।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

বেশ তো, আমি তোমাকে শেখাব।

কিন্তু বাঙালীটোলার কোন মেয়ে তো গান শেখে না। আমি গান শিখলে যদি কিছু বলে ?

ইন্দ্রকান্ত অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তির মত বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলে, কী আর বলবে ? তুমি তো চুরি করছ না ?

না, তা না কিন্তু…

রবিবাবু যদি তার বীরভূমের আশ্রমে মেয়েদের গান শেখাতে পারেন, তাহলে তুমি আমার কাছে গান শিখলে দোষ কী ?

অকাট্য যুক্তি।

এক থালা ফল-মিষ্টি নিয়ে মুকুন্দর মা ঘরে ঢুকতেই ইন্দ্রকান্ত বলল, মাসিমা, আমি শোভাকে গান শেখালে আপনাদের কোন আপত্তি নেই তো ?

প্রস্তাব শুনেই উনি বিস্মিত হন। মুহূর্তের মধ্যে বাঙালীটোলায় বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে নেন কিন্তু সরাসরি প্রত্যাখ্যান, নাকচ করতে সাহস হয় না। বলেন, সে তো সৌভাগ্যের কথা কিন্তু বাবা, বাঙালীটোলার মানুষদের তো তুমি চেনো…

গান শেখা তো কোন অন্যায় না মাসিমা ? তাছাড়া আমি তো কোন পেশাদারী গাইয়ে না।

সে কী আর আমি বুঝি না বাবা ! তবু একবার ওর বাবার সঙ্গে কথা বলে নেব।

মেসোমশায়ের মতামত তো নিতেই হবে। তিনি অনুমতি না দিলে তো আমিও শেখাব না।

শোভাই প্রথম, কিন্তু বছর খানেক ঘুরতে না ঘুরতেই বাঙালী-

টোলার পাঁচ-ছ'টি ঘর থেকে হারমোনিয়ামের আওয়াজ সারা পাড়ায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। শিষ্যরা মাঝে মাঝে অনুযোগ করে, ওস্তাদ! তুমি আজকাল আমাদের দিকে নজর দিচ্ছ না।

আমাকে পছন্দ না হলে তোমরা অন্য কোন ভাল ওস্তাদের কাছে শিখতে পারো।

ওরা সবাই এক সঙ্গে প্রতিবাদ করে, না না, ওস্তাদ, তোমার কাছে ছাড়া আর কারুর কাছে আমরা গান শিখব না।

ইন্দ্রকান্ত ওদের বিনোদন ব্যবস্থা আরও একটু উন্নত করতেই সব শিষ্যরা চুপ। তাছাড়া ইতিমধ্যে ইন্দ্রকান্ত শিষ্যদের নিয়ে মুঙ্গেরের বাঈজীর কাছে গিয়ে সারারাত ধরে ঠুংরী শোনার পর তো শিষ্যরা ওর গোলাম হয়ে গেল।

মেয়েদের গান শেখা নিয়ে বাঙালীটোলায় গুঞ্জন উঠলেও তা বাইরে আত্মপ্রকাশ করল না। তার একমাত্র কারণ ইন্দ্রকান্ত। সারা পাড়ার সব বাড়িতেই ওর যাতায়াত, সবার সঙ্গেই ওর ভাব। তাছাড়া গুরুজনদের প্রতি ও সব সময় শ্রদ্ধাশীল ও কথাবার্তায় অত্যন্ত বিনয়ী।

ইন্দ্রকান্ত অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলেই সব মেয়েকেই দু-একটা কীর্তন বা শ্যামাসঙ্গীত শিখিয়েছিল। ওরা মাঝে মাঝে বুড়ো-বুড়ীদের সেসব গান শোনাত বলে সারা পাড়ায় ইন্দ্রকান্তর জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে গেল।

একদিন মলিনা কথায় কথায় বলল, জানেন ইন্দ্রকান্তদাদা, সবাই আপনার প্রশংসা করে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। মলিনা একটু থেমে বলে, আপনার প্রশংসা শুনতে আমার খুব ভাল লাগে।

কেন?

ও মুখ নিচু করে বলে, তা বলতে পারব না কিন্তু সত্যি আমার ভাল লাগে।

কিন্তু তুমি তো আমার প্রশংসা কর না।

মলিনা মুহূর্তের জন্য ওর দিকে তাকিয়েই দৃষ্টি গুটিয়ে নিয়ে বলে, আমি প্রশংসা করলে যে লোকে নানা কথা বলবে!

ন্যাকামি করে ইন্দ্রকান্ত জিজ্ঞেস করে, লোকে আবার কী বলবে?

বলবে মানে সন্দেহ করবে!

কী আবার সন্দেহ করবে?

মলিনা প্রথমে বলতে চায় না কিন্তু ইন্দ্রকান্ত কয়েকবার অনুরোধ করার পর অত্যন্ত দ্বিধা ও কুণ্ঠার সঙ্গে বলে, সবাই সন্দেহ করবে আমি আপনাকে ভালবাসি।

এবার ইন্দ্রকান্ত একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে খুব চাপা গলায় জিজ্ঞেস করে, কেন, তুমি আমাকে ভালবাসো না?

মলিনা শুধু মাথা নেড়ে জানায়, হ্যাঁ।

ইন্দ্রকান্ত সঙ্গে সঙ্গে ডানহাত দিয়ে ওর মুখখানি আলতো করে একটু তুলে ধরে বলে, তোমাকেও আমার খুব ভাল লাগে।

আনন্দে গর্বে কৃতজ্ঞতায় মলিনা প্রায় আত্মহারা হয়ে যায়। মনে মনে একটু ভয়ও হয়, দ্বিধা করে। বলে, আমার মত সামান্য মেয়েকে আপনার কখনও ভাল লাগতে পারে না।

হঠাৎ ইন্দ্রকান্ত দু'হাত দিয়ে ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে, সত্যি মলিনা, তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে।

সে রাত্রে মলিনা দু'চোখের পাতা এক করতে পারে না। স্বপ্ন দেখে, সানাই বাজছে, রাজবাড়ি আলোয় আলো, কত শত-সহস্র অতিথির আগমন হচ্ছে, অসংখ্য দাস-দাসীর দৌড়াদৌড়ি, স্বয়ং অবলাকান্ত ওকে আশীর্বাদ করছেন, বিন্দুবাসিনী স্নেহচুম্বন দিয়ে কোলে তুলে নিয়েছেন।

আরও কত কি ভাবে।

রাত কাটতে না কাটতেই সেই পরম আকাঙ্ক্ষিত তিথি, সেই অনুপম মাধুরী রাত। মদির দৃষ্টিপাতেই কী রোমাঞ্চ! স্পর্শে? আশ্চর্য শিহরণের ঢেউ বয়ে যাবে শরীর দিয়ে।

তারপর?

ধীরে ধীরে, তিলে তিলে মহানন্দে আত্মসমর্পণ। যৌবন-মানস সরোবরে দ্বৈত অবগাহন।

তোমার কী শরীর খারাপ?

মলিনা মাথা নেড়ে বলে, না।

ইন্দ্রকান্ত প্রশ্ন করে, তবে তোমাকে দেখে ক্লান্ত লাগছে কেন?

মলিনা মুখ নিচু করে একটু হেসে বলে, কাল সারারাত শুধু আপনার কথাই ভেবেছি। এক মিনিটের জন্যও ছুটো চোখের পাতা এক করতে পারিনি।

এবার ইন্দ্রকান্ত একটু হেসে বলে, তুমি তো শুধু কাল সারারাত আমার কথা ভেবেছ কিন্তু আমি যে বহু রাত জেগেই তোমার কথা ভাবছি।

সত্যি?

আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?

না, না, তা কেন বিশ্বাস করব না? কিন্তু···

কিন্তু কী?

আমার মত সামান্য মেয়েকে নিয়ে আপনার এত ভাবনা-চিন্তা করা কী ঠিক হচ্ছে?

ইন্দ্রকান্ত আবার একটু হেসে বলে, মলিনা, ভালবাসার এই তো বিপদ!

শুধু শ্রবণে বা গন্ধে-স্পর্শে কী কামিনীরঞ্জনের নাতির মন ভরে?

ঘরে ঘরে ইন্দ্রকান্তর সঙ্গীত শিক্ষার আসর সত্যি বড় বেশী জমে উঠেছিল কিন্তু হঠাৎ বনবিহারী মুখুজ্যের নাতনী যোগমায়ার সঙ্গে তার সঙ্গীত শিক্ষক ইন্দ্রকান্তর বিয়েতে সবাই চমকে উঠলেন। তাছাড়া বিয়ের ছুদিনের মধ্যে নবদম্পতি সুদূর রাজপুতানায় চলে যাওয়ায় সারা বাঙালীটোলায় গুঞ্জন উঠল। কেউ কেউ সরাসরি বনবিহারীবাবুকেও জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার হে বনবিহারা, হঠাৎ ওদের বিয়ে, হঠাৎ ওদের উধাও হয়ে যাওয়া কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে।

বনবিহারী গড়গড়া টানতে টানতে বলেন, ওরে বাপু, নাতনীকে

দেখে হঠাৎ অবলাকান্তর পছন্দ হল বলেই হঠাৎ বিয়ে হল। এতে আর অবাক হবার কী আছে?

কিন্তু বিয়ের পর পরই ওরা এমন করে শহর ছেড়ে গেল বলেই নানাজনে নানা কথা বলছে।

বনবিহারীবাবু বেশ গম্ভীর হয়েই বলেন, যারা নানা কথা বলাবলি করছে তারা তো জানেন যে রাজপুতানাতেও ওদের অনেক সম্পত্তি আছে। তাছাড়া ওখানে এক ওস্তাদের কাছে নাতজামাই গান শিখবে।

পাড়ার লোকজন এই কৈফিয়ত শুনে ঠিক খুশি হয় না।

বনবিহারীবাবু বলেন, ওরে বাপু, ইন্দ্রকান্ত তো আমার নাতনীকে নিয়ে পালিয়ে যায়নি। রীতিমত বৈদিক মন্ত্র পাঠ করে সাতপাক ঘুরে বিয়ে করেছে।

উনি একটু দম নিয়ে বলেন, আসলে নাতজামাইয়ের প্রতি অনেকেরই লোভ ছিল। আমার নাতনীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বলে অনেকেই তাই হিংসায় জ্বলে-পুড়ে মরছেন।

বনবিহারীবাবু যাই বলুন না কেন, বাঙালীটোলার সবাই বুঝলেন, কোন কেলেঙ্কারী ধামাচাপার জন্যই এমন তাড়াহুড়ো করে বিয়ে হবার পরই ওরা রাজপুতানা চলে গেছে।

নিশিকান্ত ও শ্রীকান্তকে নিয়েও অবলাকান্ত ও তার স্ত্রী বিন্দুবাসিনীর অশান্তির শেষ নেই। তাই তো কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্তে থাকার আশায় ওরা দুজনে একদিন কাশী যাত্রা করলেন।

॥ ছয় ॥

কামিনীরঞ্জন শেষ জীবনে বোধ হয় পাপ-পুণ্যের একটু হিসেব-নিকেশ না করে পারেননি। বয়সকালে অধিকাংশ মানুষই খ্যাতি-যশ-অর্থ-প্রতিপত্তির মোহে কত কী করে। অনেক সময় পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্যও নিজের বিবেককে নির্বাসন দিতে হয়। না দিয়ে উপায় থাকে না কিন্তু যখন দেহের শক্তি কমে আসে, মোহের মেঘ কেটে

যায়, কামনা-বাসনার মহাসমুদ্র শুকিয়ে আসে, তখন একবার পিছন ফিরে না তাকিয়ে কেউ পারেন না। শেষ পারানির কড়ি যোগাড় করার জন্যই বোধ হয় সবাইকে জমাখরচের খাতাটা নিয়ে বসতেই হয়। বাবা বিশ্বনাথের শ্রীচরণে জীবন নিবেদিত না করতে চাইলেও এই জমা-খরচের খাতা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার জন্যই কামিনীরঞ্জন মৃত্যুর আগে এই বাঙালীটোলার বাড়িতে দু'এক বছর কাটান।

অবলাকান্ত সেই সময় দু'এক মাস এখানে কাটিয়েছেন কিন্তু তারপর আর আসা হয়নি। আগ্রহও হয়নি। কেউ ওকে কাশী যাবার কথা বললেই উনি হাসতে হাসতে বলতেন, কোন দুঃখে হতচ্ছাড়া বিধবাদের ভিড়ের মধ্যে থাকব ?

বিন্দুবাসিনী দেবীও এর আগে একবার মাত্র এ বাড়িতে এসেছেন। সে কী আজকের কথা ? তখন সবে ওর বিয়ে হয়েছে। শাশুড়ীর সঙ্গে এসেছিলেন কিন্তু এই গলির মধ্যে বাড়ি দেখেই ওঁর মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল। হাজার হোক নতুন বউ। শাশুড়ীকে কিছু বলতে পারেননি কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, জীবনে আর এই নোংরা ঘিঞ্জি গলির মধ্যে ঢুকবেন না।

শুধু অবলাকান্ত বা বিন্দুবাসিনী না, এ সংসারের সবাই কোন না কোন সময় এই ধরনের কথা বলেন কিন্তু এ সমাজ-সংসারে তো কোন কিছুই চিরকালের জন্য উপেক্ষিত থাকে না, থাকতে পারে না। যে পর্বতমালা একদিন মহাসাগরের তলদেশে লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিল, সেই একদা উপেক্ষিত পর্বতমালার নামই তো হিমালয় !

যাই হোক কাশী বাঙালীটোলার এই বাড়িটি বেশ বড়। তিনতলায় মোট দশ-বারোটি ঘর ছাড়াও বাথরুম-পায়খানা-ছাদ-উঠান তো আছেই। আর আছে একটি শিবমন্দির। কামিনীরঞ্জন যোগেন শাস্ত্রী নামের এক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে শিবমন্দিরের নিত্য পূজার দায়িত্ব দিয়ে বাড়ির এক কোণার দুখানি ঘরে বিনা ভাড়ায় থাকতে দেন। এছাড়া কোন মাসোহারার ব্যবস্থা না থাকলেও তিথি-পার্বণে কামিনীরঞ্জন অবশ্যই ওকে দু'পাঁচ টাকা মনিঅর্ডার করতেন।

অবলাকান্ত রওনা হবার কয়েক দিন আগে এই শাস্ত্রী মশায়ের ামেই চিঠি লিখে জানান, উনি সস্ত্রীক আছেন। সঙ্গে দু'একজন াস-দাসীও থাকবে কিন্তু ওরা এখানে এসে দেখলেন, শাস্ত্রীমশাই বিশ-বাইশ বছর আগেই দেহরক্ষা করেছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মধ্যম ুত্র জগদানন্দ শাস্ত্রী শুধু তাঁর শূন্য স্থান পূর্ণ করেননি, আরও অনেক কিছু করেছেন। ঘর না, কোণার দুখানি পুরো একতলাটিই জগদানন্দ খল করেছেন ও মাসিক পনেরো টাকায় পুরো দোতলাটি ভাড়া দিয়েছেন দুটি পরিবারকে। উনি অবশ্য অনুগ্রহ করে তিনতলাটি ালি রেখেছেন বোধ হয় ওদেরই অতিথি-অভ্যাগতদের জন্য।

বাড়িতে এত লোকজন দেখেই বিন্দুবাসিনীর মেজাজ বিগড়ে গেল কিন্তু অবলাকান্ত ওকে বললেন, আগে একটু গুছিয়ে বসতে দাও। তারপর সব ঝেঁটিয়ে বিদায় করব। ওরে বাপু, আমার নাম অবলা হলেও আমি ঠিক অবলা নই।

হাজার হোক জমিদার। অন্য লোকজনের সঙ্গে থাকা তো অভ্যেস নেই। তাই এত বিরক্তি, কিন্তু তিনতলাতেও বড় বড় তিনখানি ঘর, একটি ছোট ঘর, দুটি বাথরুম-পায়খানা, দুপাশে বিরাট ারান্দা ছাড়াও রান্নারঘর-ভাড়ার ঘর-টর তো আছেই। ঘরদোরগুলো সুন্দর সাজান-গোছানো। তার অবশ্য কারণ আছে। কামিনীরঞ্জন এই তিনতলাতেই থাকতেন এবং সকাল-সন্ধ্যায় পূবদিকের বারান্দায় সে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই বোধহয় মনে মনে সারা জীবনের মা-খরচের খাতাটা উল্টে দেখতেন।

জগদানন্দ বাড়িতে ভাড়াটে বসালেও ওঁদের অত্যন্ত সমাদরে ভ্যর্থনা করলেন ও ওঁদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কোন ত্রুটি রাখলেন

অবলাকান্ত কিছু জিজ্ঞেস না করলেও উনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ললেন, বড় জমিদারবাবু এত বড় বাড়ি কিনলেও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন বিধিব্যবস্থা করে যাবার সময় পেলেন না। তাছাড়া উইলে যদি ই বাড়ি আপনাদের কারুর ভাগে পড়ত, তাহলেও একটা বিধি-াবস্থা নিশ্চয়ই হতো কিন্তু এ বাড়িটা হয়েছে ভাগের মা!

অবলাকান্ত কোন মন্তব্য না করে শুধু বলেন হু !

এত বড় বাড়িটাকে ঠিক রাখতে কী কম খরচ ? তাছাড়া পূজা-পার্বণের খরচ ছাড়াও ট্যাক্সের উৎপাত তো আছেই। জগদানন্দ যেন একটু জোর করেই হেসে বলেন, আপনাদের কৃপায় আমিই কোন মতে সব দায়িত্ব বহন করছি।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

জগদানন্দ বলে যান, তাছাড়া সারা বাঙালীটোলা জানে এটা জমিদার কামিনীরঞ্জন বাঁড়ুজ্যের বাড়ি। তাই পূজা-পার্বণের সময় প্রসাদ পাবার জন্য কাশীর অর্ধেক বাঙালী এ বাড়িতে হাজির হবেই।

জগদানন্দের স্ত্রীও বিন্দুবাসিনীকে খুশি করতে মহা ব্যস্ত ! রান্না-বান্না তো করছেনই, তাছাড়া প্রতিদিন চুল বেঁধে, আলতা পরিয়ে দিতে দিতে কত কথা বলেন।...যাই বলুন মা, যাদের সম্পত্তি, তারাই যদি মাঝে মধ্যে না আসেন, তাহলে কী ভাল লাগে ? আপনাদের পায়ের ধূলা পড়তে না পড়তেই সারা বাড়ির চেহারাই বদলে গেছে।

জগদানন্দের এক ছেলে, দুই মেয়ে। ছেলেটি গগন স্মৃতিতীর্থের টোলে পড়াশুনা করছে। এ ছাড়া এই বাঙালীটোলারই দুটি বাড়িতে নিত্য পূজা করে। মেয়ে দুটি বাড়িতেই পড়াশুনা করে। গৃহকর্মেও অত্যন্ত পটু।

প্রথম ক'দিন জগদানন্দের সংসার থেকেই দু'বেলা খাবার এসেছে। বিন্দুবাসিনী একটু আপত্তি করে বলেছিলেন, আমি তো ঝি-চাকর নিয়েই এসেছি। অযথা তোমরা কষ্ট করবে কেন ?

জগদানন্দের স্ত্রী গিরিবালা বললেন, মা, আপনাদের সেবা করার সুযোগ পাওয়া তো পরম সৌভাগ্যের কথা। তাছাড়া আপনারা একটু গুছিয়ে-টুছিয়ে নিন।

যাইহোক প্রথম দিন পার্শে মাছের ঝোল খেয়েই অবলাকান্ত বললেন, চমৎকার রান্না। এতো ভাল রান্না তো বহুকাল খাই না।

গিরিবালা ঘোমটার আড়াল থেকেই বললেন, বাবা, এ রান্না আমার বড় মেয়ের।

বিছানায় শোবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বামী ঘুমিয়ে পড়লেও অন্নপূর্ণা ঘুমাতে পারেন না। সারা রাত চোখের জল ফেলেন।

কোন কোনদিন ইয়ার-দোস্তদের নিয়ে আড্ডা শুরু হতেই ঝণ্টুবাবু তলব করে পাঠান। অন্নপূর্ণা দরজার বাইরে থেকে বলেন, দেওকীনন্দন, ছোটবাবুকে জিজ্ঞেস কর তো, আমাকে ডাকছেন কেন?

দেওকীনন্দনকে কিছু বলতে হয় না। ঝণ্টুবাবুই ডাক দেন, কাম ইন সুন্দরী! কাম ইন!

ভিতরে যাবার অসুবিধে আছে। আমি এখান থেকেই শুনি···

নেকড়ে বাঘের মত এক লাফে স্ত্রীর সামনে এসেই ঝণ্টুবাবু ওকে একটা লাথি মেরে বলেন চল শালী, আমার ইয়ার-দোস্তদের মাল ঢেলে দিবি।

না, অন্নপূর্ণা কিছুতেই ভিতরে যান না কিন্তু বিনিময়ে ওকে অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে হয়।

শেষ পর্যন্ত ঝণ্টুবাবু অর্থের বিনিময়ে কখনো মুঙ্গের, কখনো পাটনা থেকে নিত্য নতুন সখী আমদানী করে বাড়িতে বসেই স্ফূর্তি করা শুরু করলেন। তারপর যখন আর কুলাতে পারেন না, তখন চাকর-বাকরদের স্ত্রী-মেয়েদের নিয়ে টানাটানি শুরু হল। বন্ধু-বান্ধবরাও কম গুণধর ছিলেন না। ঝণ্টুবাবু নেশার ঘোরে বিভোর হতেই অতুল মুখুজ্যের মেজ ছেলে বা গৌর বাঁড়ুজ্যের ছোট ভাই লুকিয়ে-চুরিয়ে কতদিন অন্নপূর্ণার ঘরে হাজির হয়েছে এবং চূড়ান্ত অপমানিতও হয়েছে। দু'একবার উনি দেওকীনন্দনকে দিয়ে ওদের ঘর থেকে বের করে দিয়েছেন। সেই প্রথম আমলের ঝি ষষ্ঠীর মা বাঙালীটোলার এই বাবুদের কী কম গালাগালি দিয়েছে?

মহেন্দ্রবাবু কোর্টে বেরুবার পর ওঁর স্ত্রী নানা কথার পর সুবোধবাবুকে বললেন, কাশীর বাঙালীটোলার অতি সাধারণ ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে হলেও আমার শাশুড়ী সত্যি একজন আশ্চর্য মহিলা ছিলেন। ওঁর আঠারো বছর বয়সে কৃষ্ণার বাবার জন্ম হয় আর তার সাত বছর পরই উনি বিধবা হন।

সুবোধবাবু জিজ্ঞেস করেন, আপনার শ্বশুরমশাই তাহলে বেশ অল্প বয়সেই মারা যান ?

উনি একটু হেসে বললেন, জমিদার বাড়ির ছেলেদের যত রকমের বদ গুণ থাকতে পারে, তা সবই ওঁর ছিল। অত অত্যাচার করলে কেউ দীর্ঘজীবী হয় ?

সুবোধবাবু একটু মাথা নাড়েন।

আমার শ্বশুরমশাইরা পাঁচ ভাই ছিলেন। তার মধ্যে একমাত্র ন'শ্বশুর যেমন চরিত্রবান, তেমনি বুদ্ধিমান ছিলেন। উনি পৈতৃক সম্পত্তি তো নষ্ট করেনইনি, উপরন্তু নিজেও বহু সম্পত্তি করেন।

ওর ছেলেমেয়েরাও কী এখানেই···

না, না। সম্পত্তি ভাগাভাগি হবার পরই উনি রাঁচী চলে যান। শেষ জীবনে অবশ্য মানভূম সিংভূমের ওদিকেই কাটিয়েছেন।

ভিতরের বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে ওঁদের কথাবার্তা হয়। মহেন্দ্রবাবুর স্ত্রী নিঃসঙ্কোচে বলে যান, আমার শাশুড়ী যে কি দুঃখে-কষ্টে ছেলেকে মানুষ করেছেন, তা আপনি ভাবতে পারবেন না। জমিদার বাড়ির বউ হলেও তাঁকে প্রায় আজীবনই এই বাঙালীটোলার বাড়ি বাড়ী গিয়ে ছাত্রছাত্রী পড়াতে হয়েছে।···

আচ্ছা !

আমার ন'শ্বশুরের তিন ছেলেই অত্যন্ত উচ্চ শিক্ষিত। দুজন তো বিলেত থেকে ডাক্তারী পাস করেন। কিন্তু বড় তিন শ্বশুরের কোন ছেলেমেয়েই লেখাপড়া শেখেননি।

সুবোধবাবু বলেন, কী দুঃখের !

মহেন্দ্রবাবুর স্ত্রী একটু হেসে বলেন, লেখাপড়া না শিখলে কী হয় ! তাদের চাল-চলন কথাবার্তা দেখেশুনে আপনি স্তম্ভিত হয়ে যাবেন।

সুবোধবাবু একটু হাসেন।

হাসছেন কী দাদা ? এককালে জমিদার ছিলেন বলে ওঁরা এখনও নন্-ম্যাট্রিক ছেলের বিয়ের সময় বিশ-বাইশ হাজার নগদ দাবী করেন।

সুবোধবাবু এবার একটু জোরেই হাসেন। তারপর জিজ্ঞেস করেন, আপনি কী আপনার শাশুরীকে দেখেছেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, উনিই তো আমাকে পছন্দ করে আনেন। উনি একটু থেমে বলেন, উনি আমার বাবাকে এই পরিবারের সব কথা বলার পর বলেছিলেন, আমার ছেলে চরিত্রহীনও না, নেশাখোরও না। তবে বাপ-ঠাকুর্দা তো জমিদার ছিল। তাই মেজাজটা আছে। আর লম্বা-চওড়া কথাবার্তাও বলে কিন্তু ছেলে খারাপ না।

সুবোধবাবু একটু বিস্মিত হয়েই বলেন, খুব বলিষ্ঠ চরিত্রের মহিলা না হলে ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ করতে গিয়ে এসব কথা বলা অসম্ভব।

অন্নপূর্ণা দেবী সত্যি এক অসামান্যা মহিলা ছিলেন। ছেলের বিয়ে দেবার কিছুদিন পরই উনি পুত্রবধূকে বললেন, আমি চাই তুমি গ্রাজুয়েট হও। হাজার হোক জমিদারবাড়ির ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে। এদের মতি-গতি কবে কী হয়' কিচ্ছু বলা যায় না। গ্রাজুয়েট হলে তুমি স্বচ্ছন্দে মেয়েদের স্কুলে মাস্টারী করে সসম্মানে থাকতে পারবে।

তারপর সত্যি সত্যি যখন পুত্রবধূকে কলকাতার বেথুন কলেজে ভর্তি করে দিলেন, তখন বাঙালীটোলার ঘরে ঘরে কী সমালোচনা কিন্তু উনি কিচ্ছু গ্রাহ্য করেননি।

সুবোধবাবু জিজ্ঞেস করলেন, মহেন্দ্রবাবু কী আপত্তি করেছিলেন?

উনি সম্মতিও দেননি, আপত্তিও করেননি। তাছাড়া উনি মাকে যেমন ভক্তি, তেমনই ভয় করতেন। বুড়ো বয়সেও মার একটি কথা অমান্য করার সাহস ওঁর হয়নি।

আপনার শাশুড়ী কবে মারা যান?

আমার ছোট মেয়ের জন্মের ঠিক এক বছর পর উনি মারা যান।

তাহলে উনি বেশ পরিণত বয়সেই মারা যান?

হ্যাঁ। মহেন্দ্রবাবুর স্ত্রী একটু হেসে বলেন, আমার শাশুড়ী আমাকে কী কী উপদেশ দিয়ে ছিলেন জানেন।

কী উপদেশ দিয়েছিলেন?

উনি একটু চাপা হাসি হেসে বলেন, উনি বলেছিলেন, আমার ছেলে যদি কোনদিন চরিত্রহীন বা মাতাল হয়, তাহলে একদিনও তার সঙ্গে ঘর করবে না। আর মেয়েদের বি. এ-এম. এ. পাস তো করাবেই। তাছাড়া আমাদের এই বাঙালীটোলার অধিকাংশ বাঙালী-দের মত যারা শুধু অতীত নিয়ে বড়াই করে, সেসব পরিবারে কখনোই মেয়েদের বিয়ে দেবে না।

সুবোধবাবু বলেন, ইংরেজ আমলের প্রথম যুগে বাঙালীই প্রথম ইংরেজদের সংস্পর্শে আসে, বাঙালীই প্রথম ইংরেজি শিক্ষা পায় বলে সমগ্র উত্তর ভারতে বাঙালীর প্রতিপত্তি ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগেনি কিন্তু পরবর্তীকালে বিহার-উত্তরপ্রদেশ বা পাঞ্জাব-রাজস্থানে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী পিছু হটাতে বাধ্য হয়।...

ঠিক বলেছেন দাদা!

তাছাড়া এদের অনেকরই তেমন শিক্ষাদীক্ষা না থাকলেও ইংরেজ-দের কৃপায় বা স্থানীয় সহজ-সবল মানুষদের ঠকিয়ে প্রচুর টাকাকড়ি সম্পত্তিও করেন।...

সে তো একশ' বার!

ঐ টাকাকড়ি সম্পত্তি হবার ফলে ওদের অনেকেরই ছেলেমেয়ে লেখাপড়া শেখার তাগিদ বোধ করেনি।

মহেন্দ্রবাবুর স্ত্রী বলেন, এই জেনারেশনটাই তো এখনো বাঙালী-টোলার মাতব্বর হয়ে বসে আছে। পরনিন্দা, পরচর্চা, পরশ্রীকাতরতা ছাড়া ওঁদের আর কোন গুণ আছে বলেই মনে হয় না কিন্তু মজার কথা ওদের ছেলেমেয়েরা ঠিক উল্টো হচ্ছে।

হঠাৎ মহেন্দ্রবাবু ঘর পেরিয়ে বারান্দায় পা রেখেই স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলেন, নিশ্চয়ই আমাদের এই বাঙালীটোলার পিণ্ডদান করছ?

ওঁর স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন, বাঙালীটোলার গুণকীর্তন করার কোন কারণ ঘটেছে কী!

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ওদের পাশে বসেই মহেন্দ্রবাবু হাসতে

হাসতেই বলেন, ওহে বাপু, যেমন বীজ লাগাবে, তেমন গাছ হবে। যখন কলকাতার পথে-ঘাটে বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ-কেশব সেন-শিবনাথ শাস্ত্রী বা রবি ঠাকুর-সি. আর. দাশ ঘুরে বেড়াতেন, তখন এখনকার বাঙালীরাও অনেক ভাল ছিল।

এবার উনি সুবোধ বাবুর দিকে তাকিয়ে বলেন, কী অধ্যাপক সাহেব, ভুল বললাম নাকি?

না, না, ঠিক বলেছেন।

উনি হাসতে হাসতে আবার ওকে বলেন, আমার সুযোগ্য সহধর্মিণীকে একটু বুঝিয়ে বলুন তো, হেডঅফিসে গণ্ডগোল থাকলে ব্রাঞ্চ অফিসে কী ঠিক মত কাজকর্ম হয়?

কৃষ্ণা দূরে দাঁড়িয়েছিল। সুবোধবাবু ওকে কাছে ডাক দিলেন। ও পাশে এসে দাঁড়াতেই উনি হাসতে হাসতে বলেন, আমাদের হেডঅফিস-ব্রাঞ্চঅফিস—দুটোই তোমাকে ভালভাবে চালাতে হবে। আমরা বাপ-বেটা দুজনেই কিন্তু বেশ ফাঁকিবাজ ও আড্ডাবাজ!

কৃষ্ণা লজ্জায় দৃষ্টিটা গুটিয়ে নিয়ে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়কে প্রণাম করেই দৌড়ে ভিতরে চলে যায়।

লেটার বক্স

মানুষ মনে মনে কত কথাই বলে। বলবেই। কখনো নিজেকে, কখনো অন্যকে। মানুষের সেই অনুচ্চারিত ভাষা কখনো কখনো ছায়া মূর্তি ত্যাগ করে জীবন্ত রূপ নেয়—কথায় বা চিঠিতে।

আশেপাশে হাতের কাছে যাদের পাওয়া যায়, শুধু তাদের সঙ্গেই আমরা কথা বলি, বলতে পারি। কিন্তু ক'জন মানুষকে হাতের কাছে পাওয়া যায়? নাকি সম্ভব? কত আত্মীয়-বন্ধু প্রিয়জনই তো দূরের বাসিন্দা। দূরের প্রবাসের এইসব মানুষদের সঙ্গেই তো বেশী কথা বলতে মন চায় কিন্তু তা কী সম্ভব?

এই দূরের মানুষদের সঙ্গে কথা বলার লোভেই আমরা চিঠি লিখি। হাজার হোক চিঠি তো শুধু অক্ষর দিয়ে গড়া দু'চারটে বাক্যের সমাবেশ নয়। চিঠি হচ্ছে মানুষের মনের দর্পণ প্রাণের প্রতিবিম্ব।

রথের মেলায় কিছু মানুষ হারিয়ে যায়। সমবেদনশীল মানুষের সাহায্যে কিছু কিছু পথভ্রষ্ট মানুষ আবার আপন ঘরে ফিরে আসেন। কাউকে আবার থানা-পুলিসের শরণাপন্ন হতে হয়। তবুও কী সবাই ঘরে ফেরার সৌভাগ্য লাভ করে?

না। সম্ভব নয়। কেউ কেউ চিরদিনের জন্য, চিরকালের জন্য হারিয়ে যান। যাবেই।

মানুষের মত চিঠিপত্রও যে পথভ্রষ্ট হয়, ঘরে ফেরার পথ খুঁজে পায় না এবং তাদের নিয়েও যে এত কাণ্ড হয়, তা কী আগে জানতাম? সেদিনের সে অঘটন না ঘটলে হয়তো কিছুই জানতে পারতাম না। অনেক দিন আগেকার কথা। আমি তখন পঁচিশ টাকা মাইনের রিপোর্টার। তবু সব রকম খবর সংগ্রহে আমার উৎসাহের সীমা নেই। রবীন্দ্রজয়ন্তী, মনুমেণ্টের পাদদেশের বিশাল জনসমাবেশ থেকে লালবাজার-রাইটার্স বিল্ডিং সব-কিছু কভার করি। আরও কত কি।

সেদিন ছিল বিরোধী দলগুলির রাইটার্স অভিযান। তখন ষোল আনায় এক টাকা হতো বলেই বোধ হয় রাজনৈতিক দলের সংখ্যাও কম ছিল। এখন একশ'টি আণ্ডা-বাচ্চা নিয়ে এক টাকায় সংসার বলেই বোধ হয় সব রাজনৈতিক দলগুলিই অনেক ছানা প্রসব করেছে। তাইতো তখন তিন-চারটে বিরোধী দল-হুঙ্কার দিলে সাড়ে ছ'ফুট লম্বা চীফ মিনিস্টারেরও হৃদ্‌কম্প হতো। তাছাড়া তখন গণতন্ত্র সমাজতন্ত্রের ফুলঝুরি এত ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েনি বলেই বোধ হয় বিরোধী দলগুলির অভিযানকে রাজভবন অতিক্রম করে রাইটার্স বিল্ডিং' এর অনেক কাছে আসতে দেওয়া হতো।

সেদিন এই রকমই এক সরকার-বিরোধী অভিযানকে পুলিস বাধা দিল ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রিটের প্রায় উত্তর সীমান্তে -মিশন রো'র কাছাকাছি, লালদীঘির একটু দূরে। তখন ঐ ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীটই ছিল কলকাতার রাজনৈতিক কুরুক্ষেত্র। কখনও দু'চারটে জ্বালাময়ী ভাষণ ও সরকারের দরবারে স্মারকলিপি পেশ করেই বিক্ষোভের পরিসমাপ্তি ঘটত। কখনও আবার শুরু হতো দক্ষযজ্ঞ।

চোখের নিমেষেই দপ করে জ্বলে উঠল আগুন। প্রথমে এলোপাথাড়ি কাঁদানে গ্যাস কয়েক মুহূর্ত পরেই গুলী। পর পর কয়েক রাউণ্ড। হাজার হাজার লোকের দৌড়দৌড়ি হুড়োহুড়ির মাঝখানে আমিও চোখে একটু জল দেবার জন্য পাগলের মত এদিক-ওদিক করছি। হঠাৎ খেয়াল হল ডি-এল-ও অফিসের সিঁড়ির একপাশে এক ফলওয়ালার পরিত্যক্ত জলের পাত্র পড়ে আছে। দৌড়ে গিয়ে দেখি, কে বা কারা সে জলের পাত্র আগেই নিঃশেষ করেছে। সমস্ত পৃথিবীটা অন্ধকার দেখছি। ঠিক সেই চরম মুহূর্তে হঠাৎ চিৎকার, এই খোকা, গুলী খেয়ে মরবে। শীগ্‌গির ভিতরে এসো। এর পরেই কে যেন আমাকে একটানে অফিস ঘরের ভিতরে টেনে নিয়েই বকুনি, পলিটিক্স করতে গিয়ে কী মরবে?

আমি পলিটিক্স করি না। আমি রিপোর্টার।

রিপোর্টার?

হ্যাঁ।

ব্যস! সেই সেদিন থেকে উনি আমার শৈলেনদা। আমার তখন কতই বা বয়স! বড় জোর উনিশ-কুড়ি। আর শৈলেনদা তখন পঞ্চাশের ঘরে তবু কেমন একটা প্রীতির বন্ধন গড়ে উঠল। রাইটার্স-লালবাজারে বেশী কাজ না থাকলে মাঝেমাঝেই চলে যাই ঐ ডি-এল-ও অফিসে শৈলেনদার কাছে চা টোস্ট খাই গল্প করি। আস্তে আস্তে ওঁর গোয়াবাগানের বাড়িতেও যাতায়াত শুরু হল।

বুঝলে বাচ্চু, মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। কী ভেবেছিলাম আর কী হল!

ছাদে বসে চা-মুড়ি খেতে খেতে শৈলেনদা একবার বহু দূরের আকাশের কোলে দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে বললেন, খুব ইচ্ছে ছিল অধ্যাপক হব কিন্তু সারাটা জীবনই এই ডি-এল-ও অফিসে কাটিয়ে দিলাম।

রথের মেলায় হারিয়ে যাওয়া মানুষের মত পথভ্রষ্ট দিশাহারা চিঠি-পত্রকে তার গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেবার জন্য সিপাহী বিদ্রোহের ও কুড়ি বছর আগে জন্ম নেয় ডি-এল-ও ডেড লেটার অফিস। যুদ্ধের বাজারের কন্ট্রাক্টর অ্যালবার্ট ঘোষ যেমন আবার অঘোরনাথ ঘোষ হয়েছেন, ডি-এল-ও অফিসেরও নতুন নামকরণ হয়েছে। এখন এর সরকারী নাম আর-এল-ও। রিটার্ন লেটার অফিস। তবে শৈলেন-দাদাদের মত পুরানো আমলের সবাই বলেন ডি-এল-ও।

শৈলেনদা চায়ের কাপে এক চুমুক দিয়ে একটু ম্লান হেসে বললেন, ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে রাঁচী বেড়াতে গিয়েই সব গড়বড় হয়ে গেল।

কেন?

আমার মেজ জ্যেঠু রাঁচী হেড পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টার ছিলেন। বিরাট কোয়ার্টার্স। চারদিকে কত খোলামেলা জায়গা। কলকাতায় তো বিশেষ খেলাধুলা করতে পারতাম না, রাঁচী আমার খুব ভাল লাগত।

শৈলেনদা একটু থেমে এক গাল মুড়ি আর এক চুমুক চা খেয়ে

আবার বলেন, জেঠুর দু ছেলেই তখন কলেজে পড়ে। ওরা কলেজে গেলে আমি রোজ পোস্ট অফিসেই বেশ কিছু সময় কাটাতাম।

সেদিনও শৈলেনদা পোস্ট অফিসের এদিক-ওদিক ঘোরা-ঘুরি করতে করতে হঠাৎ সর্টিং-এর ওখানে যেতেই একজন সর্টার ওর হাতে একটা খাম দিয়ে বললেন, দেখ তো খোকাবাবু এই ঠিকানাটা পড়তে পারো কিনা।

চিঠিটার উপর দিয়ে বেশ কয়েকবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে উনি আস্তে আস্তে বললেন, মো-বা-বা-দু···

ওর মুখের কথা শেষ হবার আগেই দুজন সর্টার প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল, হা, হা, মোরাবাদীই হোগা।

ব্যাস! এই অপাঠ্য ঠিকানা উদ্ধারের খ্যাতির কৃপায় শৈলেনদাকে রোজই দু' পাঁচটে ঠিকানা পড়ে দিতে হয়। সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই শৈলেনদা সর্টিং সেক্সনের সবার বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। ওঁর দু-এক ঘণ্টা সময় ওখানে বেশ কেটে যায়।

হু ইজ দিস বয়?

বিনা মেঘে বজ্রঘাতও এর চাইতে ভাল। স্বয়ংভু পারিটেনডেণ্ট বঅ পোস্ট অফিস লিভিংস্টোন সাহেবের কথা শুনেই সর্টিং সেক্সনের সবার মুখ শুকিয়ে গেল।

পোস্টমাস্টার কৃপাসিন্ধু চৌধুরী খুব ভালভাবেই জানতেন, পোস্ট অফিসের মধ্যে এবং বিশেষ করে সর্টিং সেক্সনে ভ্রাতুষ্পুত্রের আগমন ঠিক হয়নি। তবু তিনি সাহস সঞ্চয় করে বললেন, স্যার, ও আমার ভাইপো। ও ক'দিনের মধ্যেই অপাঠ্য ঠিকানা উদ্ধারের একজন এক্সপার্ট হয়ে গেছে।

ইজ ইট! মিঃ লিভিংস্টন হাসতে হাসতে সর্টারদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, টুমাদের মডত করে?

সব সর্টাররা এক সঙ্গে ঘাড় কাত করে বলল, জী হুজুর!

ব্যাস! আর এক-মুহূর্ত দেরি না। মিঃ লিভিংস্টোন সঙ্গে সঙ্গে পোষ্টমাষ্টার সাহেবকে বললেন, ভাইপোকে নিয়ে তুমি কলকাতায় মিঃ

মুর-এর সঙ্গে দেখা করবে। আমি ওকে আগে থেকে বলে রাখব। হি মাস্ট জয়েন ডি-এল-ও।

সেদিন কৃপাসিন্ধু চৌধুরীর সেকি আনন্দ! উল্লাস! ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিয়ে কোয়ার্টার্সে ফিরেই চিৎকার করে গিন্নীকে বললেন, শুনছ! স্বয়ং লিভিংস্টোন সাহেব বাদলের চাকরির ব্যবস্থা করে দিলেন। এই-সব সাহেবদের অধীনে চাকরি করেও আনন্দ।

চৌধুরী গিন্নী পান-দোক্তা লাঞ্ছিত দন্ত বিকশিত করে বললেন, বল কি গো!

ওরে বাপু হ্যাঁ! এ হচ্ছে ইংরেজের বাচ্চা! পাকা জহুরী। এরা এক মিনিটে ধরতে পারে কাকে দিয়ে কি হবে। কৃপাসিন্ধুবাবু একটু চাপা হাসি হেসে বললেন, এই ক্ষমতা না থাকলে ওরা পৃথিবী-ব্যাপী সাম্রাজ্য চালাচ্ছে কী করে?

চৌধুরী গিন্নী শৈলেনদার মাথায়-মুখে হাত দিয়ে বললেন, সুখে থাক বাবা! বাবা-মাকে সুখী কর।

এবার কৃপাসিন্ধুবাবু শৈলেনদার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোর মত ভাগ্যবান লাখে একজন হয় না। সাহেবের মান রাখিস বাবা! তা না হলে আমি মুখ দেখাতে পারব না।

॥ দুই ॥

অতীতের ডি-এল-ও আজকের আর-এল-ও সত্যি এক বিচিত্র অফিস। হাজার-হাজার লাখ-লাখ চিঠিপত্র-পার্শেল-প্যাকেটের ঠিকানা উদ্ধার করতে না পারায় পোস্ট অফিস থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এই দপ্তরে।...রাম লখন সিং, ৫২ লরী, ক্লীব ইসষ্ট্রিট, কলকাতা। হিন্দীতে লেখা এই ঠিকানা দেখে পোস্ট অফিসের সর্টাররা কোন কিছু বুঝতে না পারলেও আর-এল-ও অফিসে নতুন করে ঠিকানা লিখে দেওয়া হয়---রাম লখন সিং, বামার লরী, ক্লাইভ ষ্ট্রিট (নেতাজী সুভাষ রোড), কলকাতা।

ক্রশ ষ্ট্রীটের ঠিকানার বহু চিঠিতেই লেখা থাকে -X ষ্ট্রীট; অথবা

অনেক ছেলেছোকরার দল বন্ধুবান্ধবকে শুধু নম্বর দিয়ে ঠিকানা লিখে পাঠায়—

নাম—4, 1, 21, 4/ 20, 15, 16, 14, 15

গ্রাম—2, 1, 18, 11, 21, 1, 7, 15, 10, 15,

পোঃ—19, 1, 21, 18, 4।

উড়িষ্যা।

আর-এল-ও অফিস চোখের নিমেষে ঠিকানাটি করে লিখে দেয়—

DAUD TONPO

Vill—BARKULA GOJO

P.O.—SARDA

Dist—SUNDARGARH (ORISSA)

কোন কোন চিঠিতে আবার লেখা থাকে —চাকাই ব্রিস্ট। আর-এল-ও লিখে দেয়—চক্র বেড়িয়া…। গ্রামগঞ্জ থেকে একটু ইংরেজী জানা অনেকেই লেখে—ছাম মার্কেট ষ্ট্রীট। আসলে ওটা শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

নানা রকমে গাইড আর কর্মীদের তীক্ষ্ণ সাধারণ জ্ঞানের দ্বারাই অধিকাংশ পথভ্রষ্ট চিঠিপত্তর সঠিক জায়গায় পৌছে যায়। তবে সব সময় কখনই নয়।

এই আর-এল-ও অফিস নিয়ে শৈলেনদার সঙ্গে গল্প করতে আমার খুব ভাল লাগে। লাগবে না কেন? আমরা জানি, পোষ্ট কার্ড—ইনল্যাণ্ড খামে চিঠি লিখে আমরা ডাকবাক্সে ফেলি। তারপর? দু'দিন আগে বা পরে সে চিঠি পৌছে যায় সঠিক ঠিকানায়। প্রয়োজনে উত্তর এসে যায় যথা সময়ে। কার কোন চিঠি হারিয়ে গেল তা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা কী?

আমাদের মাথাব্যথা না থাকলেও আর-এল-ও অফিসের মানুষদের মাথাব্যথা আছে বৈকি। তা না হলে শক্তি চৌধুরী কী মার অপারেশনের আগে পৌঁছতে পারতেন? যদি ঠিকানা উদ্ধার করতে না পারেন, তাহলে আপনারা কী করেন? আমি শৈলেনদাকে প্রশ্ন করি।

প্রয়োজনে আমরা চিঠি খুলি পড়ি। যদি ঐ চিঠি পড়ে ঠিকানা উদ্ধার করা সম্ভব হয়, তাহলে তো ভালই কিন্তু যদি তা না হয়, তাহলে যিনি চিঠি লিখেছেন, তাকেই ফেরৎ পাঠিয়ে দিই।

যদি তার ঠিকানা থাকে, তবেই তো?

সে তো একশ'বার।

তার মানে অনেক মানুষের অনেক চিঠিও আপনাদের পড়তে হয়?

তা হয় বৈকি!

কথাটা বলেই শৈলেনদা একটু আনমনা হয়ে গেলেন। দূরের আকাশের কত অসংখ্য ছোট-বড় খ্যাত-অখ্যাত তারকা দেখে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, যারা আমাকে চেনে না, জানে না, জীবনে কোনদিন দেখেনি ও দেখবে না, তাদের কতজনেরই কত কি জানলাম!

...স্নেহের খোকা, আমি জানি এই চিঠি পেয়ে তুই অবাক হয়ে যাবি। কোনদিন কাউকে চিঠিপত্র লিখি না, দরকারও হয় না। যার বাপের বাড়ি, শ্বশুর বাড়ি পাশাপাশি গ্রামে, যার ভাইবোনেরা পর্যন্ত আশেপাশের গ্রামেই থাকে, সে কাকে চিঠি লিখবে? এর আগে কবে কাকে চিঠি লিখেছি, তা মনেও পড়েনা। তবু তোকে চিঠিলিখছি। লিখতে বাধ্য হচ্ছি। না লিখে উপায় নেই। বেশ কিছুদিন ধরেই ভাবছি তোকে চিঠি লিখব কিন্তু নানা কারণে তা সম্ভব হয়নি। সারা দিনরাত্তির সংসারের হাজার কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকি যে সত্যি সময় পাই না! তাছাড়া তোর অফিসের নাম-ধাম-ঠিকানা কিছুই জানা ছিল না। সবাইকে বলতেও পারি না। শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্ট করে তোর অফিসের নাম জেনে এই চিঠি লিখছি। আশা করি দু'একদিন দেরী হলেও এ চিঠি তোর হাতে পৌঁছবে।

আজ তিন বছর তুই দেশ ছাড়া। এর মধ্যে একদিনের জন্যও দেশে আসিসনি। কোনদিন আসবি কিনা তাও জানি না। মাঝে মাঝে মনে হয়, তুই জীবনে এদিকে না এলেই ভাল হয কিন্তু তোকে আর দেখতে পাব না ভাবলেও আমার মাথা ঘুরে যায়, চোখে জল আসে। তোকে একবার দেখার জন্য মন বড়ই আকুলি-বিকুলি করে কিন্তু ত

কী করে সম্ভব ? কে আমাকে নিয়ে যাবে ? বা যেতে দেবে ? আমি যে দাসী, কপর্দক শূন্য। সর্বোপরি আমি যে বাল্যবিধবা। এ সংসারে যার স্বামী-পুত্র নেই, অর্থ নেই, যাকে শ্বশুর-ভাসুরের দাসীবৃত্তি করে এক টুকরো কাপড় আর দুমুঠো অন্নের সংস্থান করতে হয় তার আবার ব্যক্তিগত ইচ্ছা।

এইত ক'দিন আগেকার কথা। হঠাৎ শ্বশুরমশাই আমাকে বললেন, হ্যাগো ছোট বৌমা, তোমার একটা গরদের কাপড় আছে না ?

হ্যাঁ, খোকা মাস্টারী করে আমাকে যে গরদের কাপড়টা দিয়েছিল···

আছে কিনা তাই বল। খোকা-খুকীর কথা তো আমি জানতে চাইনি।

বারান্দায় বসে পান-দোক্তা চিবুতে চিবুতে শাশুড়ী-ঠাকরুণ বাঁকা চোখে একবার ছোট বৌকে দেখে নিয়ে স্বামীকে বললেন, আঃ! তুমি চটছ কেন ? খোকা ছাড়া ছোট বউয়ের আপনজন কে আছে ?

এবার উনি একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, যার জন্য আমরা গ্রামে মুখ দেখাতে পারি না, সেই খোকার কথা আমাদের শুনতেই হবে।

শ্বশুরমশাই গিন্নীর কথার কোন জবাব না দিয়ে শুধু বললেন, তুমি তো ঐ কাপড়টা ব্যবহার কর না। তাই বলছিলাম, এবার থেকে ঐ কাপড়টা পরে আমি নারায়ণ পূজা করব।

যক্ষের ধনের মত আমি ঐ কাপড়টা রোজ রাত্তিরে একবার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে মনে করতাম, তোকেই যেন জড়িয়ে ধরেছি। যাইহোক কাপড়টা দেবার পর আমি আর কিছুতেই চোখের জল আটকাতে পারলাম না। ব্যস! ঐ চোখের জল দেখেই শাশুড়ী দপ করে জ্বলে উঠলেন, ওরে বাপু গ্রামের লোক এমনি এমনি বদনাম দেয় না। নিজের পেটের ছেলে না হলে এত দরদ আসে কোথা থেকে।

খোকা, সত্যি বলছি ঐ কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলার জন্য আমাকে যে কি অপমান সহ্য করতে হয়েছিল, তা শুধু ভগবানই

জানেন। মনের দুঃখে আমি পুরো দুটো দিন মুখে একটা দানা পর্যন্ত দিইনি, দিতে প্রবৃত্তি হয়নি। পরে মেজ পিসী আমাকে টেনে নিয়ে জোর করে খাইয়ে দিয়ে বলল, ওরে হতভাগী, না খেয়ে থাকবি কোন্ দুঃখে রে? এ বাড়ির জমিজমায় কী তোর স্বামীর ভাগ ছিল না? দশটা না, পাঁচটা না, তোর একটা পেটের খাবারও কী সে ভাগ থেকে হয় না?

ঐ মেজ পিসীর জন্য আমি এখনও বেঁচে আছি কিন্তু আজ তোকে আমি জানতে বাধ্য হচ্ছি, মেজ ভাসুরের যা মতি-গতি তাতে আমি কতদিন বেঁচে থাকতে পারব, তা ঠিক বলতে পারি না। তোকে আমি পেটে ধরিনি ঠিকই কিন্তু তোর মা তোর জন্মের পর পরই ধনুষ্টঙ্কারে মারা যাবার পর তোকে কোলে তুলে নিয়েই আমি সদ্য বৈধব্যের যন্ত্রণা ভুলেছিলাম। এ বিশ্ব-সংসারে তুই-ই আমার একমাত্র আপনজন। শুধু তোর কাছেই আমার সব দুঃখের কথা বলতে পারি বলেই জানাচ্ছি, মেজ ভাসুর বিপত্নীক হবার পর থেকেই আমার সম্পর্কে বড় বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছেন কিন্তু ওঁর ঐ অহেতুক আগ্রহ দেখে আমার ভীষণ ভয় হয়। হাজার হোক তুই আমার প্রাণপ্রিয় সন্তান। তাছাড়া তুই বড় হয়েছিস। তোকে বেশি কি আর লিখব। শুধু জেনে রাখ, আমি জীবনে কোন অন্যায় করিনি এবং করব না। আমার পরম শ্রদ্ধেয় মেজ ভাসুর মশাই যদি সম্মান ও সৌজন্যের সীমা লঙ্ঘন করেন, তাহলে আমি তা নীরবে মেনে নিতে পারব না। শুধু এইটুকু জেনে রাখ, তোর মা কোন কলঙ্ক নিয়ে এ পৃথিবীতে একদিনের জন্যও বাঁচবে না।...

শৈলেনদা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন, চিঠিটা পড়ে মাথা ঘুরে গেল কিন্তু কিভাবে ঐ ভদ্র-মহিলার খোকার কাছে চিঠিটা পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করব, তা ভেবে পেলাম না।

কেন? ঠিকানা ছিল না?

ঠিকানা ঠিক থাকলে কী চিঠি আমাদের কাছে আসে? মনে মনে বলি, তাইতো।

উনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তবুও আমরা অনেকে মিলে অনেক চেষ্টা করেও ওকে চিঠিটা পৌঁছে দিতে পারলাম না!

চিঠিটা কী ফেরত পাঠালেন?

না, সে ঠিকানাও চিঠিতে ছিল না। চিঠিটা জিয়াগঞ্জে পোস্ট করা হয়েছিল কিন্তু আর কিছু জানা গেল না।

আমি চুপ করে থাকি কিন্তু চোখের সামনে এক অসহায় বিধবার বেদনার্ত মুখের ছবি ফুটে ওঠে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর শৈলেনদা বললেন, দশ-পনর দিন পর হঠাৎ খবরের কাগজে দেখি, জিয়াগঞ্জের কাছেই গঙ্গার জলে এক মধ্যবয়সী বিধবার মৃতদেহ পাওয়া গেছে।...

যা আশঙ্কা ছিল, তাই সত্যে পরিণত হল। হিংস্র দানবের লালসার শিকার হল আরও একটি বিধবা কিন্তু তাতে সমাজ-সংসারের কি আসে-যায়?"

জানো বাচ্চু, ঐ ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক না থাকলেও খবরের কাগজে ঐ রিপোর্ট পড়ার পর আমরা যেন পরমাত্মীয় বিয়োগের ব্যথা অনুভব করেছিলাম।

॥ তিন ॥

ঠিকানা ঠিকই ছিল। বাড়ির নম্বর, রাস্তার নাম, পোস্ট অফিস, জেলা—সব ঠিক ছিল। পিয়ন যথা নিয়মে চিঠি পৌঁছে দেয় নির্দিষ্ট ঠিকানায়। অন্তত আশা করা যায়। কখনো যে ভুল হয় না, তা নয়। ভুল হয় বৈকি। তাই বোধহয় হয়েছিল। তা না হলে আবার ডাক বাক্সে দেবে কেন? এবার পিয়ন একটু সতর্ক হয়েই চিঠি পৌঁছে দিল চিঠিতে লেখা ঠিকানায়। সে চিঠি পরের দিনই আবার ডাক বাক্সে ফিরে এল।

এবার পিয়ন চিঠি বিলি করতে গেলেই গৃহস্বামী বললেন, আরে মশাই, এ বাড়িতে বিকাশ চৌধুরী বলে কেউ থাকে না। এ চিঠি ফেরত নিয়ে যান।

খামের চিঠি। হাতে লেখা ঠিকানা। খামের কোথাও পত্রদাতার নাম-ঠিকানা লেখা নেই। সাধারণতঃ থাকে না। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের চিঠি হলে খামের এক জায়গায় লেখা থাকত If undelivered, please return to…

শেষ পর্যন্ত সে চিঠি এসে হাজির আর-এল-ওতে। শৈলেনদার হাতে এমনি আরও একটা খামের চিঠি এল। চিঠি দুটো হাতে নিয়ে শৈলেনদার একটু খটকা লাগল। দুটি খামের ঠিকানাই কী একই মানুষের লেখা?

না, না, তা কি করে সম্ভব? একটা চিঠি পোস্ট হয়েছে শ্রীরামপুরে অন্যটি গোবরডাঙা। শ্রীরামপুরের চিঠিটা ফেরত এসেছে বেহালা থেকে, অন্যটি উত্তরপাড়া থেকেএই ধরনের চিঠিপত্রকে পত্রলেখককেই ফেরত পাঠাতে হয়। অথবা দেবার চেষ্টা করা হয়। অনেক সময় খামের বাইরে প্রেরকের নাম-ঠিকানা না থাকলেও চিঠির মধ্যে নাম-ঠিকানা পাওয়া যায় এবং সে জন্যই শৈলেনদা চিঠি দুটো খুললেন।

এ্যাঁ!

না, না, এ দুটি চিঠি কখনই দুজনের লেখা নয়—একই মানুষের লেখা। নিশ্চয়ই! একশ'বার! হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ মানুষের হাতের লেখা দেখতে দেখতে এমনই অভ্যস্ত হয়ে গেছেন যে ভুল হতে পারে না। কিন্তু…তবু শৈলেনদার খটকা লাগে। একই মানুষের লেখা। একই দিনে পোস্ট করা কিন্তু কোথায় শ্রীরামপুর আর কোথায় গোবরডাঙা। নাকি ইনি শ্রীরামপুরে বাস করেন ও গোবরডাঙায় চাকরি-বাকরি ব্যবসা-বাণিজ্য করেন? অথবা গোবরডাঙা থেকে শ্রীরামপুরে যাতায়াত করেন?

আপন মনেই মাথা নাড়েন শৈলেনদা। ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না।

পরের চিঠি পড়তে কিছু কিছু মানুষের আগ্রহ-উৎসাহের সীমা নেই। মেয়েদের হস্টেলের বিগত যৌবনা প্রৌঢ়া সুপারিনটেনডেন্ট ছাত্রীদের চিঠি পড়ার সময় নিজের অতীত জীবন বেমালুম ভুলে যান।

সত্ত বিবাহিত-বিবাহিতাদের চিঠিপত্র পড়তেও বহুজনের আগ্রহ দেখা যায় কিন্তু আর-এল-ও রিটার্ন লেটার অফিসের কর্মীদের মধ্যে এই ধরনের উৎসাহ বা আগ্রহ নেই। হওয়া সম্ভব নয় পেটের দায়ে, চাকরির খাতিরে বাধ্য হয়ে যাদের নিত্য অন্যের চিঠি পড়তে হয়, তাদের কী এ বিষয়ে উৎসাহ থাকতে পারে?

তাইতো শৈলেনদা চিঠি দুটো টেবিলের উপর রেখে সুকুমারদার ঘরে চা খেতে গেলেন। ফিরে এসেও সিগারেট ধরিয়ে বেশ কিছুক্ষণ কাটাবার পর প্রায় অনিচ্ছার সঙ্গেই একটা চিঠি পড়তে শুরু করেন।

দু'চার লাইন পড়ার পরই শৈলেনদা সিগারেট ফেলে দিয়ে হঠাৎ খুব মনোযোগ দিয়ে চিঠিটা পড়লেন। বার বার বেশ কয়েকবার। যতবার পড়েন ততবারই সন্দেহ আরও বাড়ে। মনে হল কি যেন অঘটন ঘটতে যাচ্ছে। তাইতো চিঠিটা আবার আস্তে আস্তে পড়তে শুরু করেন।···

প্রিয় সন্তু, আগামী মাসের তিন তারিখ থেকে আমাদের পাড়ার জগদীশ সরকারের মেয়ে শিউলি আর তার বর ধ্রুব জলদাপাড়া ফরেস্ট বাংলোয় দশ দিন থাকবে। আমি এই মাসে ২৮ তারিখ থেকে মিঃ ও মিসেস বিমল ব্যানার্জী নামে ঐ ফরেস্ট বাংলোয় একটা ঘর এক সপ্তাহের জন্য রিজার্ভ করেছি।

তুই ছোট বৌদিকে নিয়ে ২৭ তারিখে দার্জিলিং মেলে রওনা হবি এবং ২৮-এ অবশ্যই ওখানে পৌঁছবি। ৪ তারিখে বিকেলে তোরা বাংলো ছাড়বি ও সবাই জানবে তোরা রাত্রের ট্রেনে কলকাতা রওনা হবি। তুই কাছাকাছি কোথাও গা ঢাকা দিয়ে কাটাবার পর রাতে একটা থেকে দেড়টার মধ্যে কাজ শেষ করবি? ঠিক সময় হাতের কাছেই জীপ থাকবে। তারপর আমার দায়িত্ব।

২৫ তারিখে দুপুরে ১২টা ১০ মিনিটে খদ্দরের পায়জামা-পাঞ্জাবি-জওহর কোর্ট পরা একটা ছেলে হাওড়া স্টেশনের কফি কর্নারে ঢুকবে। ও যে টেবিলে বসবে তোর লোকও যেন সেই টেবিলে বসে ও ওঠার সময় ব্রীফকেস বদলাবদলি হবে। ঐ ব্রীফকেসে সম্প্রতি গঙ্গায় ধরা

খুব ভাল ইলিশমাছ ছাড়াও রেলের টিকিট, ফরেস্ট বাংলো রিজার্ভেশানের কাগজ ও দশ দিস্তা নতুন কাগজ থাকবে।

চিঠি এখানেই শেষ। চিঠির নিচে কোন নাম নেই। শুধু লেখা আছে—ইতি তোর প্রিয় বন্ধু!

শৈলেনদা আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে অন্য চিঠিটা পড়েন···

বিকাশ, গত সপ্তাহে গঙ্গায় যে ইলিশ ধরা পড়েছে, সেটা আর দশ দিস্তা নতুন কাগজ একটা ব্রীফকেসে ভরবে। তারপর ঐ ব্রীফকেস নিয়ে ২৪ তারিখ বিকেল ৩টা ১৫ মিনিটের সময় ইডেনগার্ডেনের ক্লাব হাউসের গেটে আসবে। ওখানে ধুতি-শার্ট পরা এক ভদ্রলোক ইসারা করলে তার পিছন পিছনে যাবে ও সুবিধা মত জায়গায় ব্রীফকেসটি ওকে দিয়ে দেবে।

এ চিঠি এখানেই শেষ কিন্তু এর নিচে নাম আছে—ইতি নন্দ।

দুটি চিঠির কোনটিতেই পত্রপ্রেরকের ঠিকানা ছিল না এবং থাকলেও এ চিঠি আর-এল-ও অফিস থেকে পত্রপ্রেরকের কাছে পাঠানো হতো না।

শৈলেনদা আপনমনে কথা বলতে বলতে একটু থামতেই আমি জিজ্ঞেস করি, চিঠি দুটো আপনাদের অফিসে এল কেন?

উনি একটু হেসে বললেন, আসলে সন্তুর নামের নিচে বিকাশের ঠিকানা লেখা ছিল।

আবার বিকাশের নামের নিচে বুঝি সন্তুর ঠিকানা লিখেছিল!

হ্যাঁ।

যাই হোক, তারপর কী হল?

চিঠি দুটো সঙ্গে সঙ্গে আমরা লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগে পাঠিয়ে দিলাম।

শৈলেনদা এবার একটা সিগারেট ধরিয়ে দু'একটা টান দেবার পর বললেন, আর দুটো দিন দেরি হলেই সর্বনাশ হয়ে যেত।

আসল ব্যাপারটা কী ছিল?

কী আর ব্যাপার? গুণ্ডা-বদমাইস্‌রা যা করে আর! কি নাম-

ঠিকানা ঠিক থাকলে ঐ ধ্রুব বেচারী প্রাণ হারাত আর শিউলিকে নিয়ে নন্দ ব্যাঙ্গালোর চলে যেত।

তাই নাকি?

তবে কী?

ধ্রুব কী অপরাধ করেছিল যে···

আমার কথার মাঝখানেই উনি বলেন, নন্দ বিখ্যাত গুণ্ডা ও বদ্‌মাইস ছিল। ও নেপাল থেকে আফিঙ স্মাগলিং করে এনে বিদেশে পাচার করত। এই কাজের জন্য ও একদল মেয়েকে রেখেছিল। শৈলেনদা একটু হেসে বললেন নন্দ এই মেয়েগুলোর সঙ্গে স্ফূর্তিও করত।

কিন্তু ধ্রুব?

বলছি, বলছি।

আমি আর প্রশ্ন করি না! শৈলেনদা আবার বলে যান, আমি চুপ করে শুনি।

নন্দর এইসব কাজ-কারবারের জন্য পাড়ার লোকজন অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করলেও প্রকাশ্যে ওর বিরুদ্ধে কিছু বলতে সাহস করতেন না কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর সহ্য না করতে পেরে বেচুবাবু একদিন নিজে গিয়ে পুলিসকে খবর দিয়ে তুলকালাম কাণ্ড করে দিলেন।

তিন বছর প্রেসিডেন্সী জেলে কাটিয়ে আসার কিছুদিন পরই নন্দ হঠাৎ একদিন শিউলিকে দেখেই পাগল হয়ে উঠল। ব্যস! পরদিন ও বেচুবাবুকে গিয়ে বলল আপনার শিউলির সঙ্গে আমার বিয়ে দিন।

ঐ লম্বা চওড়া বেচুবাবু সঙ্গে সঙ্গে ওর গালে ঠাস করে একটা চড় মেরে বললেন, জবাব পেয়েছ?

নন্দ মাথা ঘুরে পড়ে যেতে যেতে নিজেকে কোন মতে সামলে নিয়ে শুধু বলল, সুদে-আসলে এর জবাব দেব।

তোমার মত পুচকে গুণ্ডাকে বেচু সরকার ভয় করে না।

সত্যি বেচু সরকার ওকে ভয় করতেন না। শিউলির বিয়ের দিন নন্দ তুজন সাগরেদকে সঙ্গে নিয়ে হামলা করতে এসে এমন শিক্ষা পেয়েছিল যে তা সে জীবনে ভুলতে পারবে না।

শৈলেনদা এক নিঃশ্বাসে সব বলে যান।

আমি জানতে চাই, নন্দ কি বেচুবাবুর মেয়ে-জামাইকে খুন করার প্ল্যান করেছিল?

মেয়েকে না, শুধু জামাইকে খতম করার প্ল্যান করেছিল। জামাইকে শেষ করে মেয়েকে নিয়ে উধাও হবার মতলব ছিল।

পুলিস ধরে ফেলেছিল নিশ্চয়ই?

ধরেছিল মানে? রাবণের গুষ্টিকে ধরেছিল। তারপর তো কেঁচো খুড়তে সাপ বেরুল।

তার মানে?

দেখা গেল, নন্দ সন্তকে দিয়ে আগে আরও তুটো মার্ডার করিয়েছে। তাছাড়া কলকাতা পোর্টে আসার সময় কিছু বিদেশী জাহাজ ডায়মণ্ডহারবারের ওদিকে গঙ্গার জলে বাক্স ভর্তি রিভলবার ফেলে দেয় ও বিকাশ সেসব নিয়ে ব্যবসা করে।

আমি একটু হেসে বললাম, ঐ রিভলবারকেই বুঝি চিঠিতে গঙ্গার ইলিশ বলেছে?

শৈলেনদা একটু হেসে বললেন, হ্যাঁ, আর দশ দিস্তা নতুন কাগজ মানে নতুন দশ হাজার টাকার বাণ্ডিল।

কয়েক বছর ধরে এই মামলা চলেছিল। দায়রা জজের রায়ের বিরুদ্ধে ওরা হাইকোর্টে আপীল করেছিল কিন্তু কিছু লাভ হয়নি! সন্ত আর নন্দ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে এখনও প্রেসিডেন্সী জেলে রয়েছে।

শৈলেনদা এই মামলার অন্যতম সাক্ষী ছিলেন। দায়রা জজ ও হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি ওঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। বিচারপতিদের প্রশংসার জন্য কিছু মাইনেও বেড়েছিল!

আর?

শৈলেনদা এখন বেচুবাবুর পরমাত্মীয়। আর শিউলি তো কাকু বলতে অজ্ঞান।

এ সংসারে কখন কোথায় যে অঘটন ঘটবে, তা কেউ জানে না, জানতে পারে না।

॥ চার ॥

আমরা চিঠি লিখি, ডাকবাক্সে ফেলি। কিছু কিছু চিঠি ঠিক সময়ে ঠিক মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। কিছু চিঠি নানা ডাকখানার মোহরে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে কয়েক দিন পর যথাস্থানে হাজির হয়। কিছু কিছু চিঠিপত্র আরও কিছুদিন ডাক বিভাগের আদর-আপ্যায়ন উপভোগ করার সৌভাগ্য লাভ করে। এসব চিঠিপত্রের ঠিকানায় লাল-কালো কালি দিয়ে কাটাকুটি থাকে কিন্তু কে বা কারা এই কাটাকুটি করে ঠিকানা সংশোধন করার দায়িত্ব বহন করেন, সে খবর আমরা রাখি না। রাখার প্রয়োজনও অনুভব করি না।

শীতের রাতে যেসব রেলযাত্রী লেপ মুড়ি দিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেন, তারা কী গার্ডসাহেব বা ড্রাইভারের রাত্রি যাপনের কাহিনী জানেন! নাকি জানতে চান? আমরা নিজেদের কাজটুকু হলেই খুশী কিন্তু কে বা কারা এই কাজ সম্পন্ন করল, তা জানতে, বুঝতে চাই না।

দুর্ঘটনাক্রমে শৈলেনদার সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় না হলে হয়তো আমিও জানতে পারতাম না, আর-এল-ও অফিসের অন্দরমহলে কে বা কারা নীরবে কত হারিয়ে যাওয়া মানুষকে আবার আমাদের কাছে এনে দিচ্ছেন। খামের উপর ঠিকানা ছিল—শ্রীদাশু দাস, গগন ডাক্তারের বাগান, পাইকপাড়া, কলকাতা। না, পাইকপাড়া পোস্ট-অফিসের কেউই গগন ডাক্তারের বাগান কোথায় তা খুঁজে পেল না। আশেপাশের কয়েকটি পোস্ট-অফিসেও চিঠিটা পাঠানো হল, ওদের ওখানেও গগন ডাক্তারের বাগানের হদিস পাওয়া গেল না।

এবার চিঠিটিকে ফেরত পাঠাবার পালা কিন্তু কোথায় ফেরত পাঠাবে? অগতির গতি আর-এল-ও। রিটার্ন লেটার অফিস।

চিঠিটা খুলেই শৈলেনদা অবাক। শুধু চিঠি না, সঙ্গে একশ' টাকার দুটি নোট। চিঠির উপরে পত্রপ্রেরকের বোম্বের ঠিকানা ছিল ঠিকই কিন্তু তবু শৈলেনদা সঙ্গে সঙ্গে চিঠিটা ফেরত পাঠালেন না। ভাবলেন, হয়তো এই টাকাটি দাশুবাবুর খুবই জরুরী দরকার। চিঠিটি ফেরত পাঠালে তো তিনি টাকাটি পাবেন না। তাই নানা কথা ভাবনা-চিন্তা করার পর শৈলেনদা চিঠিটা পড়লেন।...

শ্রদ্ধেয় দাশুদা, আমার নাম মনীষা। উকিল প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে মাতৃহীন শিশুপুত্র চন্দন আপনার স্নেহ-ভালবাসার জোরে বড় হয়, তিনি আমার স্বামী। চন্দনকে আপনি নিশ্চয়ই ভোলেননি। আপনাকেও আমার স্বামী জীবনে ভুলতে পারবেন না। বিয়ের পর থেকেই ওঁর কাছে আপনার কথা শুনেছি। উনি সব সময় বলেন, পাঁচ বছরের শিশু মৃত্যু কি, তা তো জানে না। তাই আমিও ঠিক বুঝতে পারিনি, মা মারা গিয়েছেন। বাবা আর দাশুদার কথা মত আমি ভাবতাম, মা সত্যি সত্যি ভগবানের কাছে বেড়াতে গিয়েছেন। কিন্তু সে যাইহোক, দাশুদা চব্বিশ ঘণ্টা আমাকে এমনকরে আগলে রাখতেন যে আমি মার অভাব অনুভব করার সুযোগ পেতাম না।

চিঠিতে আর কত কথা লিখব? আপনি বোধহয় জানেন না, আপনার সেই চোখের মণি চন্দন বাবা পড়াশুনা করার জন্য বহুকাল বিদেশে ছিলেন। লেখাপড়া শেষ করে ওখানে চাকরিও করেছেন। আমিও তখন বিদেশে থাকি এবং ওখানেই আমাদের বিয়ে হয়।

আমার স্বামী যখন বিদেশে পড়াশুনা করছিলেন, তখনই আমার শ্বশুরমশাই হঠাৎ মারা যান এবং তাঁর জিনিসপত্র তিন কাকার বাড়িতে চলে যায়। তাই আমার স্বামী অনেক চেষ্টা করেও বহুকাল আপনার ঠিকানা যোগাড় করতে পারেননি। আমরা বছর দেড়েক আগে এ দেশে ফিরেছি এবং মাত্র কয়েকদিন আগে আমার শ্বশুরমশায়ের একটা পুরানো ডায়েরীতে আপনার একটা ঠিকানা পেয়েই এই চিঠি লিখছি।

আমার স্বামীই আপনাকে চিঠি লিখতেন কিন্তু তিনি হঠাৎ জরুরী কাজে দিন দশেকের জন্য বিলেত যাওয়ায় আমিই চিঠি লিখছি

আমার স্বামী লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াবার বহু আগেই বাবা-মাকে হারিয়েছেন এবং তাঁদের সেবা-যত্ন করার কোন সুযোগ পেলেন না। তাইতো ওঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা আপনি আমাদের কাছেই থাকুন। তাছাড়া আপনি তো বোধহয় বিয়েও করেননি। আমাদের মনে হয়, এখানে থাকলে আপনার কোন কষ্ট বা অসুবিধা হবে না। আপনার চন্দন বাবার কথা তো বাদই দিচ্ছি। আপনাকে কাছে পেলে আমিও তো মনে করব শ্বশুরের সেবা করছি।

আপনি শুনে নিশ্চয়ই সুখী হবেন যে আমাদের একটি পুত্র সন্তান আছে। আমাদের জন্য না হলেও এই দাদুভাই-এর জন্য আপনি নিশ্চই যথাশীঘ্র সম্ভব আমাদের কাছে চলে আসবেন। আপনার আসার খরচ বাবদ এই সঙ্গে ২০০,০০ টাকা পাঠালাম এবং রওনা হবার আগে অবশ্যই কাউকে দিয়ে আমাদের একটা টেলিগ্রাম পাঠাবেন। আমরা নিশ্চয়ই স্টেশনে উপস্থিত থাকব।

আপনার প্রতীক্ষায় রইলাম।

চিঠিটা পড়ে শৈলেনদা আপন মনেই হাসেন। হাসবেন না? চিঠিটা পড়েই বুঝতে পারেন, এই দাশু নিশ্চয়ই প্রমথ উকিলের বাড়িতে কাজ করতেন এবং ইনি যে চন্দনবাবুকে পুত্রতুল্য স্নেহ করতেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আজকাল অধিকাংশ ছেলেমেয়েই তাদের বাবা-মাকে দেখে না। যেসব ছেলেমেয়েরা জীবনে উন্নতি করে, তারা যেন বাবা-মাকে আরও বেশি অপছন্দ করে। ব্যতিক্রম আছে বৈকি কিন্তু এরা যেন বিরল ব্যতিক্রম!

মনীষার চিঠির উপরের দিকে এক পাশে ওদের মালাবার হিলস্-এর ঠিকানা ছাপা। বাড়িতে দুটি টেলিফোন আছে। সুতরাং শৈলেনদা সহজেই বুঝতে পারেন, চন্দনবাবু শুধু প্রতিষ্ঠিত না, অত্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত। হয়তো বিরাট কোন কোম্পানীর ডিরেক্টর। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই যে উচ্চশিক্ষিত, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। অতীত দিনের একজন গৃহভৃত্যের জন্য এরা এত ব্যাকুল?

নিজের মনের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দেন। হবে না? সত্যিকার শিক্ষিত মানুষ কি কখনও অকৃতজ্ঞ হয়?

শৈলেনদা আরও কয়েকবার চিঠিটা পড়লেন। না পড়ে পারলেন না। সারা মন আনন্দে খুশিতে ভরে গেল। হবে না? এ সংসারে মানুষের দৈন্য দেখতে দেখতে কে ক্লান্ত না? তাইতো অকস্মাৎ কোন উদার মহৎ প্রাণের সন্ধান পেলে মন নিশ্চয়ই খুশিতে ভরে যাবে।

এইসব কথা বলতে বলতে হঠাৎ উনি একটু থামেন। তারপর বললেন, বুঝলে বাচ্চু, চিঠিটা নিয়ে মহা সমস্যায় পড়লাম।

কেন?

শুধু পাইকপাড়া না, আশেপাশের সব পোস্ট অফিসই দেখেছে ওদের এলাকায় গগন ডাক্তারের বাগান বলে কোন অঞ্চল নেই।···

ওর কথার মাঝখানেই আমি বলি, কলকাতার উত্তর-দক্ষিণ ছ'দিকেই এককালে অনেক বাগানবাড়ি ছিল ঠিকই কিন্তু পাটিশানের পর সেসব জায়গায় কত ঘরবাড়ি উঠেছে যে···

এবার উনি আমার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললেন, ঠিক ঠিক। নতুন রাস্তাঘাট দোকান-বাজার ঘরবাড়ি হাউসিং এস্টেট ইত্যাদি যা কিছু হয়েছে, তা তো ঐসব বাগানবাড়ি বা জমিদারদের বিরাট বিরাট বাড়ি-টাড়ির জায়গাতেই হয়েছে।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ।

শৈলেনদা একটু হেসে বললেন, লালবাজারের গোয়েন্দাদের মত কর্পোরেশন—ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট আর গভর্নমেণ্টের হাউসিং ডিপার্টমেণ্টে খোঁজখবর নিতে নিতে গগন ডাক্তারের বাগানের খবর জুটে গেল। আরও একটু খোঁজ নিতেই বেরিয়ে গেল, ওখানকার পুরানো বস্তি-বাসীদের কোথায় কোয়ার্টার্স দেওয়া হয়েছে।···

তারপর ঐ কোয়ার্টার্সগুলোতে খোঁজ নিতেই···

উনি আমার দিকে তাকিয়ে মাথা এদিক-ওদিক দুলোতে দুলোতে মুচকি হেসে বললেন, ওহে শ্রীমান, এ খবরের কাগজের রিপোর্টারী না যে কিছু একটা লিখে দিলেই হল।

আমি শুধু হাসি।

হঠাৎ শৈলেনদা গম্ভীর হয়ে বললেন, সমস্ত খোঁজখবর নেবার পর ঐ অঞ্চলের একজন সিনিয়র পোস্টাল ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে আমি নিজেই মনীষার চিঠি নিয়ে হাজির হলাম দাশুবাবুর আস্তানায়।

মুহূর্তের জন্য একটু থেমে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, সত্যি বলছি বাচ্চু সেদিনের কথা আমি জীবনেও ভুলব না।…

পাকা তিন-চারতলা বাড়ির কয়েকটি ব্লক। অতীতদিনের কয়েক শ' বস্তিবাসীকে এখানে ঠাঁই দিয়ে সরকার মহৎ কাজ করলেও এই আধুনিক নরক দেখে শৈলেনদার মাথা ঘুরে যায়। কচি-কাঁচা থেকে বুড়োবুড়ি মানুষ আর বেড়াল-কুকুর-গরু-ছাগল আর শুয়োরের এমন মিলে-মিশে অবাধ স্বাধীনতাভোগের এমন বিরল দৃশ্য দুনিয়ার আর কোথাও আছে বলে মনে হয় না। এমন স্বর্গরাজ্যে দাশু দাসকে আবিষ্কার করা খুব সহজসাধ্য হয়নি।

জানো বাচ্চু, মাঠের এক পাশে একটা ভাঙা খাটিয়ায় বৃদ্ধকে দেখেই বুঝলাম, মৃত্যু ওর সামনে এলে উনি বোধহয় তাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরবেন।

আমি বললাম, যেসব বুড়োবুড়িকে পরের দয়ায় বেঁচে থাকতে হয়, তাদের সবার অবস্থাই ঐ রকম।

যাইহোক আমি ওকে চিঠিটা পড়ে শোনাতেই উনি হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমি জানতাম, আমার চন্দনবাবা আমাকে ভুলে যেতে পারে না, পারে না, পারে না।

আমি কোন কথা বলি না। চুপ করে ওর কথা শুনি। শৈলেনদা আবার বলেন, তারপর ঐ চিঠি আর টাকা হাতে নিয়ে পাগলের মত চিৎকার করে বললেন, ওরে, আমার চন্দনবাবার বউ চিঠি লিখেছে, টাকা পাঠিয়েছে। আমি আর এখানে থাকব না। আমি বোম্বাই চলে যাব। শৈলেনদা আবার একটু থামেন। তারপর বললেন, সত্যি বলছি বাচ্চু, পরশপাথরের ছোঁয়ায় যেমন লোহালক্কড়ও সোনা হয়,

মনীষার ঐ চিঠিটা পেয়ে ঐ মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটাও যেন আনন্দে খুশিতে যৌবনের দিনগুলোতে ফিরে গেল।

আমি একটু হেসে বললাম, ভালবাসার পরশপাথরের ছোঁয়ায় সবকিছুই সম্ভব।

ঠিক বলেছ ভাই।

॥ পাঁচ ॥

ছোটোবেলায় আমাদের পাড়ায় বাটা কোম্পানীর এক সেলসম্যান থাকতেন। তিনি পথে-ঘাটে হাটে-বাজারে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে গিয়েও সব সময় সবার পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখতেন, কে কি জুতো পরেছেন।

পাড়ার সবাই ওকে নিয়ে ঠাট্টা করতেন। কেউ বলতেন, শম্ভুদা নিশ্চয়ই শুভদৃষ্টির সময় বৌদির মুখের দিকে না তাকিয়ে পায়ের দিকে তাকিয়েছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন ফোঁড়ন কেটে বলতেন, তার চাইতেও বড় কথা বৌদিকে খালি পায়ে দেখেই উনি বুঝেছিলেন, পাঁচ নম্বর লাগবে।

শম্ভুদা শুভদৃষ্টির সময় সত্যি সত্যি বৌদির পায়ের দিকে তাকিয়েছিলেন কিনা অথবা তাঁকে খালি পায়ে দেখে দুঃখ পেয়েছিলেন কিনা, তা আমি জানি না। তবে তার দৃষ্টি যে সর্বত্র সব সময় 'নিম্নগামী' ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তখন শম্ভুদাকে দেখে অবাক হতাম। মনে হত উনি কি অদ্ভুত মানুষ।

এখন জেনেছি, এই বিশ্ব-সংসারের অধিকাংশ মানুষই শম্ভুদা! কেউ পায়ের জুতো দেখেন, কেউ বা অন্যকিছু।

আমাদের মনোরঞ্জনবাবু মাস্টারমশাই সব সময় বলতেন, আমাদের দেশে মাস্টারদের সম্মান নেই বলেই তো দেশের এই দুর্গতি! ওরে বাপু, মাষ্টারমশাইরাই তো জাতিকে সত্যিকার উন্নত করতে পারেন। জজ-ম্যাজিস্ট্রেট বা ব্যবসাদার দিয়ে কী দেশের সত্যিকার উন্নতি হয়?

দারোগাবাবুরা চব্বিশ ঘণ্টাই চোর-ডাকাত খুন-জখম-রাহাজানি-লুঠপাট-বলাৎকার নিয়ে ব্যস্ত ও বিব্রত থাকেন বলে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে বিশেষ খুঁজে পান না। ডাক্তারবাবুদের ধারণা, সবাই কোন না কোন রোগে ভুগছেন। উকিলবাবুরা ভাবতেই পারেন না, কোর্ট কাছারি না করেও সংসারে থাকা যায়। ডেনটিস্টদের একটাই দুঃখ, দেশের লোকজন দাঁতের যত্ন নিতে শিখল না। অর্থাৎ আমরা সবাই এক একজন শম্ভুদা! অনন্ত বৈচিত্র্যময় বিশ্ব-সংসারের মানুষও কম বৈচিত্র্যে ভরা নয় কিন্তু আমরা ক'জন সেই অজানা জগতের খবর রাখি?

একদিন কথায় কথায় শৈলেনদা বললেন, চাকরি পাবার পর প্রথম দিকে খুবই মন খারাপ লাগত।

কেন?

উনি একটু হেসে বললেন, এই মাটির পৃথিবীর উপর দিয়ে হাঁটা-চলা করার সময় কি আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারি, আমাদের পায়ের নিচের মাটিতেই সোনা রুপো হিরে ছড়িয়ে আছে?

আমি মাথা নেড়ে বলি, ঠিক বলেছেন।

নানা রকম হাতের লেখা পড়তে আমার ভাল লাগলেও প্রথম প্রথম এই একঘেয়েমির কথা ভেবেই বিরক্তবোধ করতাম।...

উনি আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু আমি ওঁকে বাধা দিয়ে বললাম, কিছুদিন পরে বুঝি বুঝলেন, ঐ অসংখ্য চিঠিপত্রের জঙ্গলের মধ্যেই বহু সম্পদ ছড়িয়ে আছে?

ঠিক বলেছ ভাই। উনি মুহূর্তের জন্য আনমনা হয়ে কি যেন একটু ভাবেন। তারপর বলেন, এই চিঠিপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে কত মানুষের কত ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখের কথা যে জানলাম তার হিসেব করতে গেলেও মাথা ঘুরে যায়।

তা তো বটেই।

পিয়ন খট্‌-খট্‌ কড়া নেড়েই দরজার সামনে একটা চিঠি ফেলে দিয়েই একটু জোর গলাই বললেন, চিঠি!

পিয়নের ঐ কড়া নাড়ার শব্দটি অত্যন্ত পরিচিত। তাই তো

পিয়নের মুখের কথা বেরুতে না বেরুতেই ভদ্রমহিলা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই চিঠিটা হাতে তুলে নেন। কার চিঠি? অমল সান্যাল?

উনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে পাশের বাড়ির দরজার সামনে গিয়ে পিয়নের হাতে চিঠিটা ফেরত দিয়ে বললেন, আমাদের বাড়িতে তো অমল সান্যাল বলে কেউ নেই।

পিয়ন ঠিকানাটা আরেকবার দেখে নিয়ে বললেন, কিন্তু ঠিকানা তো আপনাদের বাড়িরই দেখছি।

হ্যাঁ ঠিকানা তো আমাদের বাড়িরই কিন্তু এ বাড়িতে তো শুধু আমরাই থাকি!

পিয়ন চিঠিটি ব্যাগের মধ্যে ভরে রেখে এগুতে এগুতেই বললেন তা তো জানি।

পনের-কুড়ি দিন পরের কথা। পিয়ন খট্‌খট্ করে কড়া নেড়েই চিঠিটা দরজার সামনে ফেলে না দিয়ে শুধু বললেন, চিঠি!

ভদ্রমহিলা ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই পিয়ন ওর হাতে আগের মতই একটা মোটা খাম দিয়ে বললেন, এ চিঠি কি রাখবেন?

ভদ্রমহিলা চিঠি হাতে নিয়ে প্রায় আপন মনেই বিড়বিড় করে বলেন, অমল ব্যানার্জী? চিঠিটা আবার পিয়নের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, না ভাই, এখানে অমল বলেও কেউ থাকে না।

কয়েকদিন পরে আবার একটা চিঠি। অশোক মুখার্জী। এবার ভদ্রমহিলা না হেসে পারেন না। বলেন, এ তো ভারী মজার ব্যাপার শুরু হয়েছে। যাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই কোনকালে যাদের নাম শুনিনি, শুধু তাদেরই চিঠি আসতে শুরু করেছে।

এবারও পিয়ন চিঠিটা ফেরত নেন কিন্তু অপর্ণাকে জিজ্ঞেস করেন, এসব চিঠি চৌধুরীবাবুর বন্ধু-বান্ধবের না তো?

অপর্ণা এক গাল হাসি হেসে বলেন, অশেষ তো পাটনার ছেলে, চাকরি করে বোম্বের এক ফার্মে। তাছাড়া ওকে ঘুরে বেড়াতে হয় আসাম-ত্রিপুরা-মণিপুর-নাগাল্যাণ্ডে। পিয়নের মনে খটকা লাগলেও মুখে কিছু বলেন না। অন্য বাড়ির দিকে দুএক পা এগিয়ে উনি আবার

পিছিয়ে এসে অপর্ণাকে বলেন, চিঠি তো কয়েকদিন পোস্টাফিসে পড়েই থাকবে, তাই একবার চৌধুরীবাবুকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন, যদি চিঠিটা ওঁর বন্ধু-বান্ধবের হয়···

উনি তো কদিন আগেই গোহাটি গেলেন, দশ-বারো দিনের আগে কখনই ফিরবেন না।

সব চিঠিগুলো এসে হাজির হয় রিটার্ন লেটার অফিসে শৈলেনদার টেবিলে। যথারীতি চিঠি-খুলেই পত্রদাতার ঠিকানা বের করার চেষ্টা করতে হয় ওঁকে।···

আমার অনেক অনেক আদরের তুমি, দার্জিলিং থেকে লেখা তোমার চিঠিখানা পেয়ে যে কি আনন্দ হল, তা লিখে জানাবার ভাষা আমার জানা নেই। সারাদিনে চার-পাঁচবার চিঠিটা পড়েও মন ভরল না বলে রাত্রে শুয়ে শুয়ে বহুবার চিঠিটা পড়লাম। তুমি যে আমাকে কত গভীর ভাবে ভালোবাসো, তা আবার নতুন করে উপলব্ধি করলাম এই চিঠি পড়ে।

মা মারা যাবার পর পরই দাদু-দিদা আমাকে ওদের কাছে নিয়ে এলেন। তখন ঠিক ছিল, আমি একটু বড় হয়ে বাবার কাছে ফিরে যাব কিন্তু মা মারা যাবার বছর খানেকের মধ্যেই বাবা আবার বিয়ে করায় আমাকে আর উনি নিজের কাছে নিয়ে যেতে পারলেন না। তাছাড়া দাদু-দিদাও আমাকে ছাড়লেন না। দাদু-দিদার কাছে খুবই আদর-যত্নে মানুষ হয়েছি কিন্তু তবুও কোথায় যেন একটা শূন্যতার বেদনা-জ্বালা অনুভব করতাম। আমি দাদু-দিদার চোখের মণি ছিলাম ঠিকই কিন্তু তবু মাঝে মাঝে মা-বাবা ভাই-বোনের সান্নিধ্য ভালবাসার জন্য মন বড় ব্যাকুল হয়ে উঠত। পাঁচজনের সংসারে মানুষ হইনি বলে আমি কোনদিনই বিশেষ কারুর সঙ্গে মেলামেশা করতে পারতাম না। স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে আমার কোন বন্ধু ছিল না বললেই হয়। তবু পড়াশুনা আর দাদু-দিদার সঙ্গে হাসিঠাট্টা গল্পগুজব করে দিন বেশ কাটত। এম. এ পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুবার কদিন আগেই দাদু মারা গেলেন। দাদুর শরীর বরাবরই খারাপ ছিল তবু কখনও

ওঁর শরীর একটু বেশি খারাপ হলেই দিদা খুবই অস্থির হয়ে উঠতে ও আমাদের ফ্যামিলী ফিজিসিয়ান ডাঃ বসুকে ডেকে পাঠাতেন ডাঃ বসুকে ঘরে ঢুকতে দেখলেই দাদু একটু হেসে বলতেন, আপনি আবার কষ্ট করে এলেন কেন? এরকম শরীর খারাপ তো আমার প্রায়ই হয়। আবার দাদু একবার আড় চোখে আমাকে ও দিদাকে দেখে নিয়ে বলতেন, আমার বুড়ী বউ কিছুতেই বিশ্বাস করে না আমার যুবতী স্ত্রী এম. এ. পাস না করা পর্যন্ত আমার কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। সত্যি, দাদু কথার খেলাপ করেননি।

যাইহোক দাদুর মৃত্যুর পর আমি জীবনে প্রথম অনুভব করলাম, কাউকে ভাল না বেসে ভুল করেছি কিন্তু ভালবাসার মানুষ কী চাইলেই পাওয়া যায়?

শুনেছি, জন্ম-মৃত্যু-বিয়ের ব্যাপারে কেউ আগে থেকে কিছু বলতে পারে না। এভাবে হঠাৎ যে আমার বিয়ে হবে, তা আমি স্বপ্নে ভাবিনি। তোমাকে দিদার এত ভাল লেগেছে যে কি বলব! তাছাড়া দিদা বার বার আমাকে একটা কথা বলেছেন, দ্যাখ দিদিভাই, তোর মত অমল ভাইও বাপ-মায়ের আদর পায়নি জ্যেঠা-খুড়োর কাছে মানুষ হয়েছে। তাইতো বলছি, ও তোকে ভালবাসায় ভরিয়ে দেবে। দিদিভাই, তুইও ওর জীবনের সব দুঃখ ঘুচিয়ে দিস।

বিয়ের পর যে ক'দিনের জন্য আমরা একসঙ্গে থেকেছি, তার মধ্যেই আমি বুঝেছি, দিদা ঠিকই বলেছেন। সত্যি ঐ ক'টা দি তুমি এমন আদর-ভালবাসায় আমাকে ভরিয়ে দিয়েছ যে তার স্বাদ মধুর স্মৃতি আমি জীবনে কোন দিন ভুলতে পারব না।

তোমার কলকাতার কাজ কবে শেষ হবে? জানি, কাজ শেষ হবার পর এক মুহূর্তও তুমি ওখানে থাকবে না। তুমি আমার কাছে ছুটে আসবে। খাওয়া-দাওয়া ঠিক মত করছ তো? আর হ্যাঁ, দিদার পরামর্শ মত উকিল দাদু দুটি ব্যাঙ্ককেই জানিয়ে দিয়েছেন, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। ব্যাঙ্ক ও নানা জায়গায় তোমার

আমার নতুন করে সই করতে হবে। তুমি এলেই সেসব কাজ সেরে ফেলতে হবে।

তুমি আমার অনেক আদর-ভালবাসা-চুমু নাও। ইতি—

শুধু তোমারই শিখা

নিছক নববিবাহিতার প্রেমপত্র। পড়তে ভালই লাগত। মনে মনে দুজনের জন্যই সমবেদনা অনুভব করেন শৈলেনদা কিন্তু পাটনার কোন্ ঠিকানায় এ চিঠি ফেরত পাঠাবেন?

চা-সিগারেট খেয়ে কিছুক্ষণ কাটাবার পর শৈলেনদা এবার অমল ব্যানার্জীর চিঠিটা খোলেন।...

আমার প্রিয়তম অমল রাজা! সত্যি বলছি, সব যেন স্বপ্নের মধ্যে ঘটে গেল। আমি এখনও সে স্বপ্নের নেশায় বিভোর হয়ে আছি। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে আমার কোন দিদির বিয়ে হয়নি। আমার দুই জামাইবাবু খুব ভাল হয়েছেন বলে মা সব সময় বাবাকে বলতেন, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া ছেলে-মেয়ে কখনই ভাল হয় না। আমার দিদিরাও সব সময় মার মত সমর্থন করেছে। তাই বাবা যখন আমার বিয়ের জন্য চারদিকে খোঁজখবর করেও পছন্দমত পাত্র পাচ্ছিলেন না, তখনও মা বাবাকে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে দেননি। এমন সময় হঠাৎ ছোট কাকা তোমার বিজ্ঞাপনটি বাবাকে পাঠালেন। বাবা কোন মন্তব্য না করে ছোট কাকার চিঠি আর বিজ্ঞাপনটি মাকে দিলেন। সবকিছু কয়েকবার পড়ার পর মা বললেন, এত উচ্চশিক্ষিত ছেলে, তার উপর বিদেশে থাকে। একটা চিঠি লিখে তো দেখ!

ব্যস! পনেরো দিনের মধ্যে তোমার-আমার বিয়ে হয়ে গেল! এখন তোমার মত জামাই পেয়ে বাবা-মার গর্ব দেখে কে!

যাই হোক হনিমুনের দিনগুলির প্রতিটি মুহূর্তের স্মৃতি আমি সারাজীবন রোমন্থন করব। সত্যি, তোমার ভালবাসায় আমিও এমন পাগল হয়ে উঠেছিলাম যে সে কথা মনে করলেও লজ্জায় মুখ লাল হয়ে উঠছে? আবার ভাবি, পাগলামি করেছি তো বেশ করেছি। তোমার

সঙ্গে নিশ্চয়ই পাগলামি করব। তাছাড়া তুমিই তো আমাকে পাগল করে তুলেছিলে।

তুমি কলকাতার কাজ শেষ করে তাড়াতাড়ি চলে এসো। এখানে দুতিন দিন না থাকলে এত জিনিসপত্তর ঠিকঠাক করবে কে? তাছাড়া তুমি তো দিল্লী হয়ে বোম্বে যাবে। বোম্বেতে কী তোমার কোন কাজ আছে? ওখানে কোন কাজ না থাকলে বোম্বের বদলে দিল্লী থেকেই তো আমরা সোজা নিউইয়র্ক যেতে পারি। নিউইয়র্ক যাবার পথে আমরা দুটি দিন কি লণ্ডন আর প্যারিসে কাটাব না?

তুমি তাড়াতাড়ি এসো। তোমাকে ছাড়া আর এক মুহূর্তেও আমার ভাল লাগে না। তাছাড়া রাত্তিরে তোমার অভাব এত অনুভব করি যে কিছুতেই স্থির হয়ে ঘুমুতে পারি না। আমার অনেক আদর ও প্রণাম নাও।

--তোমার আদরের কৃষ্ণা

তৃতীয় চিঠিটার দু'চার লাইন পড়েই শৈলেনদা সামনের টেবিলের দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁগো মানিকদা, এ তো ভারী মজার ব্যাপার দেখছি।

মানিকবাবু এই সেক্সেনের ইনচার্জ। উনি একটু মুখ তুলে বললেন, কী আবার মজার ব্যাপার হল?

শৈলেনদা হাসতে হাসতে বললেন, একই ঠিকানা থেকে তিনটে চিঠি ফেরত এসেছে। আর তিনটে চিঠিই সদ্য বিবাহিতা তিনটি মেয়ের লেখা।

একই লোককে লেখা?

দুটি চিঠিই অমল নামের দুজনকে লেখা আর···

পাশ থেকে বলাই ঘোষাল জিজ্ঞেস করলেন, একই ঠিকানায় একই নামের দুজনকে লেখা মানে?

শৈলেনদা বললেন, শুধু উপাধি আলাদা।

মানিকবাবু জিজ্ঞেস করলেন, থার্ড চিঠিটা কাকে লেখা?

অন্য নামের এক ভদ্রলোককে। কিন্তু তিনিও অন্য দুজনের মত বিয়ে

করে কিছুদিন বউয়ের সঙ্গে ঘর করার পর কিছুদিনের জন্য কলকাতা এসেছেন।

তা কি করে হয়?

তাইতো আমার অদ্ভুত লাগছে।

দেখি তো চিঠিগুলো।

মানিকবাবু খুব মন দিয়ে তিনটে চিঠি দু'তিনবার পড়লেন। কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, বুঝলে শৈলেন, ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছে না।

শৈলেনদা সঙ্গে সঙ্গে ওকে সমর্থন করে বললেন আমারও ব্যাপারটা ভাল লাগছে না।

মানিকবাবু বললেন, এ চিঠিগুলো ফেরত যাবে না।

অনেক বছর আগেকার কথা। তবু শৈলেনদার সবকিছু স্পষ্ট মনে আছে। সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ল।

আমি প্রশ্ন করি, তার মানে?

বেশীদিন না, দিন দশেকের মধ্যেই সব জানা গেল ও কেষ্টবাবু ধরা পড়লেন। কথাটা বলেই উনি একটু হাসলেন।

আমি জিজ্ঞেস করি, কী জানা গেল?

কেষ্টবাবুর কীর্তি-কাহিনী।

কেষ্টবাবু মানে?

ওরে বাপু, কলির কেষ্ট! হঠাৎ শৈলেনদার মুখ থেকে হাসির চিহ্ন উবে গেল। দু'দিকের চোয়াল শক্ত হল। ওর চোখের দিকে তাকাতেও আমার ভয় হল। একটু পরে বললেন, ও হারামজাদা এক একটা শহরে এক একটা নাম-ধাম পরিচয় দিয়ে ভাল ভাল মেয়েদের বিয়ে করত।···

বলেন কী?

হ্যাঁ ভাই, তবে আর বলছি কি! কোথাও পরিচয় দিত আমেরিকায় থাকে ও ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়, কোথাও বলত,

বিলিতি কোম্পানির এরিয়া ম্যানেজার, কোথাও আবার অন্যকিছু বলত।

কী সর্বনাশ।

ক'টা মেয়ের সর্বনাশ করেছিল জানো?

ক'টা?

পাঁচটা।

ইস!

শৈলেনদা ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখা ফুটিয়ে বললেন, ঐ জানোয়ারটা যেদিন পুলিশের হাতে ধরা পড়ল, তার পরদিনই ওর আরও একটা বিয়ে হবার কথা ছিল। ওটা হলেই হাফ ডজন হয়ে যেত।

মেয়েটি খুব জোর বেঁচে গেছে।

কিন্তু ঐ পাঁচটা মেয়ের কথা ভাবতে গেলেই আমার মাথা ঘুরে ওঠে! একজন তো আত্মহত্যাই করেছিল।

তাই নাকি?

তবে কী? এ আঘাত সবাই সইতে পারে?

ঐ অপর্ণা কী পাঁচজনের একজন?

হ্যাঁ।

॥ ছয় ॥

এ সংসারে আমরা সবাই মনে করি, সবকিছু জানি। সাধারণতঃ মানুষ—মানুষ এতই অহংকারী হয় যে, সে কিছুতেই স্বীকার করবে না, খুব সামান্য বিষয়েই তার জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা আছে, অধিকাংশ বিষয়েই সে অন্ধকারে। অহংকার আমারও ছিল। খবরের কাগজের রিপোর্টার বলে নিজেকে প্রায় সবজান্তাই মনে করতাম।

টুকটাক হোঁচট খেলেও শৈলেনদার সঙ্গে পরিচয় হবার পরই প্রথম বুঝলাম, এই দুনিয়ার মনুষ্য চরিত্র সম্পর্কে আমি কত অনভিজ্ঞ। শুধু মনুষ্য সম্পর্কে কেন, এই বিশ্ব-সংসারে কোথায় কত কি ঘটে, তারই বা কতটুকু খবর রাখি?

পোস্ট অফিস পুলিসের গোয়েন্দা দপ্তর নয়। কোন লুকোচুরির ব্যাপার এখানে নেই। সবকিছুই সবার সামনে হয়। চিঠিপত্র, রেজেষ্ট্রী, পার্সেল, মনি অর্ডার। এমনকি সেভিংস ব্যাঙ্কের কাজ-কারবারের মধ্যে কোন রহস্য বা লুকোচুরির ব্যাপার নেই। তবু চোখের সামনের এই কাজকর্মের মধ্যেও কখনো কখনো কত বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে যায়।

আর-এল-ও, রিটার্ন লেটার অফিসে শুধু চিঠিপত্রই আসে না। রেজেষ্ট্রী, ইন্সিওরড্ চিঠি-প্যাকেট-পার্সেল, মনি অর্ডার ও আরও কত কি আসে কিন্তু তাই বলে প্যাকেট বা পার্সেলের মধ্যে বোমা? না, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

অতি সাধারণ একটি ছেলে। বস্তিবাসী। হয়তো কোন কলকারখানায় সামান্য কাজ করে। অথবা আশেপাশে কোন পানবিড়ির দোকান চালায়। বয়স বড় জোর বাইশ-তেইশ কিন্তু স্বাস্থ্য বেশ ভাল। হঠাৎ দেখলে মনে হয় সাতাশ-আঠাশ। বোম্বে মার্কা হিরোদের মত মাথায় লম্বা লম্বা চুল। দাড়ি না থাকলেও গোঁফ রেখেছে লম্বা-চওড়া এক কথায় হঠাৎ দেখলে মনে হয় গুণ্ডা, মস্তান।

পিয়ন জগদীশ সরকার এ অঞ্চলে চিঠিপত্র-রেজেষ্ট্রী-মনি-অর্ডার ইত্যাদি বিলি করছেন বিশ-বাইশ বছর কিন্তু মনে পড়ে না ওদের বাড়িতে একটা পোস্টকার্ড এসেছে। তারপর হঠাৎ একদিন ঐ অসীমের নামে রেজেষ্ট্রী বুকপোস্টে একটা বইয়ের বাণ্ডিল এসে হাজির। পিয়ন জগদীশবাবু একটু অবাকই হন কিন্তু সেকথা তো প্রকাশ করতে পারেন না! সই করিয়ে প্যাকেট ওর হাতে তুলে দেন। প্যাকেটটা হাতে পেয়ে অসীমের খুশি দেখে জগদীশবাবুর বিস্ময় হয় কিন্তু সে বিস্ময়ও প্রকাশ করেন না।

জগদীশবাবু অন্যদিকে পা বাড়াতেই অসীম ওকে ডাক দেয়, দাঁড়ান, দাঁড়ান!

উনি পিছন ফিরে তাকাতেই অসীম একটু এগিয়ে তাড়াতাড়ি ওর

হাতে পাঁচটা টাকা দেয়। পিয়ন ওর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে টাকাটা পকেটে রেখে অন্যদিকে পা বাড়ান।

দিন দশ-পনের পরে আবার একটি প্যাকেট। তবে বুক পোস্টের প্যাকেট নয়, রেজিস্টার্ড পার্সেল। অসীম খুশি হয়ে জগদীশবাবুর হাতে পাঁচ টাকা দেয়।

এর পর থেকে চিঠি না, মনি অর্ডার না, অসীমের নামে নিয়মিত প্যাকেট আর পার্সেল আসে এবং জগদীশবাবুর অদৃষ্টেও কিছু কিছু প্রাপ্তিযোগ ঘটে।

তারপর হঠাৎ একদিন একটা পার্সেল ডেলিভারী দিতে গিয়ে জগদীশবাবু অসীমকে পান না। ঐ ঘর থেকেই একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে বললেন, অসীম বলে তো এখানে কেউ থাকে না।

গত কয়েক মাস ধরে যে ছেলেটি এখানে থাকত, সেই ছেলেটিই তো অসীম।

ভদ্রলোক হেসে বলেন, কি বলছেন আপনি? যে ছেলেটিকে এখানে রেখে আমি দেশে গিয়েছিলাম, তার নাম তো হৃদয়।

হৃদয়? জগদীশবাবু যেন গাছ থেকে পড়েন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হৃদয়। ওর বাবার নাম শ্রীনিবাস। এই শ্রীনিবাস আমার গ্রামের দোকানের দেখাশুনা করে।

জগদীশ একটু ভাবেন। তারপর বলেন, আচ্ছা সেই হৃদয়কে একটু দেখতে পারি?

তাকে তো আমি বাজারে পাঠিয়েছি।

এখুনি আসবে?

না, না, একটু দেরি হবে। এইতো তাকে পাঠালাম।

শেষে জগদীশবাবু বলেন, কাল এই সময় তাকে থাকতে বলবেন।

ভদ্রলোক একটু হেসে বলেন, তা বলব কিন্তু বাড়ির চাকরের নামে বইয়ের বাণ্ডিল বা পার্সেল আসে, তা তো বাপের জন্মে শুনিনি।

পরের দিন হৃদয়কে দেখে জগদীশবাবু অবাক! হা ভগবান! অসীম বলে, এই তো এত কাল সব প্যাকেট পার্সেল নিয়েছে!

হৃদয় ওরফে অসীম ইসারা-টিসারা করেও জগদীশবাবুর কাছ থেকে প্যাকেটটা হস্তগত করতে পারেনি। উনি প্যাকেট ফেরত নিয়ে চলে গেলেন।

প্যাকেটটি নিয়ে মহা সমস্যায় পড়লেন পোস্ট অফিসের বাবুরা। পার্সেলটি রেজেস্ট্রী করা হয়েছে ধানবাদ হেড পোস্ট অফিস থেকে কিন্তু যিনি এটি পাঠিয়েছেন তার নাম-ঠিকানায় আছে'—অবিনাশ, হ্যারিসন রোড, কলকাতা-১। হ্যারিসন রোডে লক্ষ লক্ষ লোকের বাস এবং তার মধ্যে কত শত অবিনাশ রয়েছে, তার কি ঠিকঠিকানা আছে?

শেষ পর্যন্ত অগতির গতি আর-এল-ও।

বুঝলে বাচ্চু, ঐ প্যাকেটের মধ্যে একটা পিস্তল ছিল।

বলেন কি দাদা?

হ্যাঁ ভাই, ঠিক কথাই বলছি।

তারপর আপনারা ঐ পিস্তল নিয়ে কি করলেন?

শৈলেনদা একটা সিগারেট ধরিয়ে লম্বা টান দিয়ে বললেন. আমরা আর কি করব? পুলিসকে খবর দেওয়া হল।

যত অনভিজ্ঞই হই, তবু তো রিপোর্টার। তাই কাহিনীর শেষটুকু না শুনে স্বস্তি পাই না। জিজ্ঞেস করি, তারপর কি হল, তা কি জানেন?

শৈলেনদা একটু থেমে সিগারেটে আবার একটা টান দিয়ে বললেন, সবকিছু জানতে পারিনি ঠিকই কিন্তু কিছু কিছু জেনেছিলাম বৈকি!

আমাকে আর প্রশ্ন করতে হয় না। উনি নিজেই বলে যান, আমরা শুধু এইটুকু জানতে পারি, ঐ ছেলেটার নাম অসীমও না, হৃদয়ও না। ওর নাম অন্য কি যেন ছিল। তার চাইতে বড় কথা ছেলেটি মোটেও ঐ ভদ্রলোকের চাকর ছিল না।...

বলেন কী?

উনি একটু হেসে বলেন, হ্যাঁ বাচ্চু, ছেলেটি বি. এ. পাস ছিল এবং পলিটিক্স করত।

আচ্ছা !

আর ঐ ভদ্রলোক কি ছিলেন জান ?

কী ?

শৈলেনদা হেসে বললেন, মূর্ছা যাবে না তো ?

ওঁর কথায় আমিও হাসি। বলি, মূর্ছা যাব কেন ?

ঐ ভদ্রলোক পুলিসের গোয়েন্দা ছিলেন।

তাই নাকি ?

শৈলেনদা মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ।

ঐ রিটার্ন লেটার অফিসে বসে ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগের সেবা করতে দশের ও দেশেরও কত কি জানা যায়।

জান বাচ্চু, প্যাকেট-পার্সেলের মধ্যে বোমা-পিস্তল-পাইপ ছাড়াও আরও কত কি পাওয়া যায়।

কত কি মানে ?

খুন করা মানুষের এক টুকরো হাত-পা পর্যন্তও আমরা পেয়েছি।

বলেন কী দাদা ?

শৈলেনদা মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ ভাই, সত্যি কথাই বলছি।

আমি তাড়াতাড়ি একটু হেসে বলি, আমি কি বলছি আপনি মিথ্যে কথা বলছেন ?

উনি গম্ভীর হয়ে বললেন, নাসিকে এক ব্যবসাদারের মেয়েকে রেপ করে খুন করা হয়। তারপর ঐ খুনী মেয়েটির বডিকে তিরিশ-বত্রিশ টুকরো করে এক একটা টুকরো দেশের এক এক জায়গায় ফল্‌স ঠিকানায় পাঠায়। ইস্‌ !

ইস্‌ করছ কি ! মানুষ কি না পারে ?

তা ঠিক। একটু থেমে জিজ্ঞেস করি, লোকটা ধরা পড়েছিল ?

হ্যাঁ. ফাঁসীও হয়েছিল।

শৈলেনদার কাছে আর-এল-ও অফিসের গল্প শুনতে শুনতে সত্যি মুগ্ধ হয়ে যাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওঁর কথা শুনি। বৌদি খেতে দিয়ে বার বার না ডাকলে আমাদের হুঁশ হত না। একদিন তো শৈলেনদার

কথা শুনতে শুনতে ঘড়ি দেখার কথা মনেই পড়েনি। যখন আমাদের বৈঠক শেষ হল, তখন রাত প্রায় একটা। সে কাহিনী আমি কোনদিন ভুলব না।···

ইন্সিওর্ড পার্সেলটা ঠিক ঠিকানাতেই গিয়েছিল কিন্তু মেয়েটির মা পিয়নকে বললেন, না, এ পার্সেল আমার মেয়ে নেবে না।

পিয়ন জিজ্ঞাসা করলেন, তবে কী এই পার্সেল ফেবত পাঠিয়ে দেব ?

ভদ্রমহিলা বেশ রাগ করেই বললেন, যা ইচ্ছে করুন, মোট কথা এ পার্সেল আমরা নেব না।

পিয়নের সঙ্গে মাকে এত কথা বলতে দেখে একটি সদ্য বিবাহিত মেয়ে ভদ্রমহিলার পাশে এসে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞেস করল, কী ফেরত দিচ্ছ মা ?

ভদ্রমহিলা কিছু বলার আগেই পিয়ন ওকে বললেন আপনার নামের এই পার্সেলটা।

মেয়েটি একটু ব্যস্ত, একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করল, কেন মা ? এই পার্সেলটা নেবে না কেন মা ?

ভদ্রমহিলা বেশ রূঢ় হয়েই বললেন, কোথাকার কে পাঠিয়েছে, তার নেই ঠিক ! যে যা পাঠাবে, তাই আমরা নেব নাকি ?

মার কথায় মেয়েটি একটু অবাক হয় কিন্তু মুখে কিছু বলে না।

এবার ওর মা প্রায় আনমনেই বলেন, কার মনে কি মতলব আছে, তার কি কোন ঠিকঠিকানা আছে !

পিয়ন আবার প্রশ্ন করেন, তাহলে এটা ফেরত পাঠাব তো ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফেরত দিন।

পিয়ন পকেট থেকে কলম বের করে লেখেন, রিফিউজড্ !

এবার মেয়েটি ওর মাকে জিজ্ঞেস করল, মা, এটা কে পাঠিয়েছেন !

কে এক অরূপ মুখার্জী !

বাপির কোন বন্ধু না তো ?

না, না, কোন জন্মেও নাম শুনিনি।

পার্সেলটি ফেরত গিয়েছিল অরূপ মুখার্জীর ঠিকানায়। সেখানে গিয়ে জানা গেল, হ্যাঁ, উনি ক'দিনের জন্য এই হোটেলে ছিলেন কিন্তু দু'তিন দিন আগেই চলে গেছেন।

বাড়ির ঠিকানা ?

খাতা খুলে ম্যানেজারবাবু বললেন, শুধু লেখা আছে দার্জিলিং।

পার্সেল কলকাতা থেকে ভুবনেশ্বর ঘুরে গেল দার্জিলিং।

সেখানে কিছুদিন বিশ্রাম নেবার পর পার্সেলটি শেষ পর্যন্ত আর-এল-ওতে হাজির।

শৈলেনদা বললেন, পার্সেলটি খুলেই ঘোষদা অবাক !

কেন ?

ওর মধ্যে একটা দামী ডায়মণ্ডের নেকলেস, একটা অত্যন্ত পুরনো সিঁদুরের কৌটো আর একটা বিশ-পঁচিশ পাতার চিঠি দেখে ঘোষদা অবাক !

আমি চুপ।

শৈলেনদা বলেন, ঘোষদা চিঠিটা পড়ার পর আমাদের সবাইকে ডেকে চিঠিটা শুনিয়েছিলেন।...

মা অনুরাধা, সবার আগে তুমি আমার প্রাণভরা স্নেহাশিস নাও।

জানি না তোমাকে আমার চিঠি লেখার অধিকার আছে কিনা কিন্তু স্নেহ-ভালবাসা মানুষের এমনই এক রকম সম্পদ যা ন্যায়-অন্যায় উচিত-অনুচিত সময়-অসময় মানতে জানে না। তোমাকে দেখতে, কাছে পেতে, আদর করার জন্য মন অনেক সময়ই ব্যাকুল হয়েছে, কিন্তু মা, তুমি তো জান, এ সংসারে শুধু হৃদয়ের তাগিদে জীবনের জটিল-কুটিল পথে চলা যায় না। সম্ভব নয়। নানা পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে আমরা সবাই নিজের মনকে উপেক্ষা করি। আমিও করেছি, না করে পারিনি। বাধ্য হয়ে করেছি। তবে বিনিময়ে কখনও বিনিদ্র থেকেছি রাতের পর রাত, কখনও আবার সবার আড়ালে চোখের জল ফেলেছি। সত্যি বলছি মা, মাঝে মাঝে শুধু তোমাকে একটু দেখার জন্য পাগল হয়ে উঠেছি। স্নেহ-ভালবাসার

আতিশয্যে তোমার কোন ক্ষতি না হয় ভেবেই পাগলামি করতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়েছি। নিজেকে সংযত করেছি, করতে বাধ্য হয়েছি। তবে রক্ত-মাংসের কোন মানুষই সব সময় সংযত থাকতে পারে না, কিছুতেই পারে না। আমিও পারিনি। কদাচিৎ কখনও ছুটে গেছি তোমার স্কুলের সামনে, কলেজের সামনে। কোনদিন তোমাকে দেখেছি, কোনদিন দেখিনি।

ঠিক পঁচিশ বছর আগে দশই ডিসেম্বর তুমি এই পৃথিবীর আলো প্রথম দেখেছিলে। তাইতো প্রতি বছর ঐ দশই ডিসেম্বর এলেই তোমাকে একটু দেখার জন্য পাগল হয়ে উঠি। একবার আমি কি করেছিলাম জানো?

অনেক টফি আর চকোলেট কিনে সোজা চলে গেলাম তোমাদের স্কুলে। সেদিন কোন কারণে তোমাদের হেডমিস্ট্রেস মিসেস রায় স্কুলে আসেনি। তাই তোমাদের প্রতিমাকে বললাম, আমার নাম অরূপ মুখার্জী। আমি বোম্বে থাকি কিন্তু জরুরী কাজে দু'তিন দিনের জন্য কলকাতা এসেছি। আজ আমার মেয়ের জন্মদিন কিন্তু ওকে কাছে পাচ্ছি না বলে···

আমি এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলেছিলাম। এবার উনি আমাকে বললেন, আগে আপনি বসুন।

হ্যাঁ, তারপর বসে বললাম, আমার মেয়ে ক্লাস ফাইভে পড়ে। তাই যদি আপনি দয়া করে অনুমতি দেন তাহলে আপনাদের স্কুলের ক্লাস ফাইভের মেয়েদের আমি একটু টফি-চকোলেট দিতাম।

প্রতিমাদি অবাক হয়ে আমাকে দেখে নিয়ে বললেন, চলুন, আমার সঙ্গে।

সেদিন ওর সঙ্গে তোমাদের ক্লাসে গিয়েছিলাম। তোমার হাতেও টফি-চকোলেট দিয়েছিলাম, মুগ্ধ হয়ে দু'চোখ ভরে তোমাকে দেখেছিলাম কিন্তু মন চাইলেও মুখ দিয়ে একটি শব্দ বের করিনি। তোমার কী সেদিনের কথা মনে আছে?

সেদিন তুমি দশ বছরে পা দিলে! আমার জীবনের সে এক অবিস্মরণীয় দিন!

তুমি যখন কলেজে-ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনা করেছ, তখনও আমি তোমাকে দেখেছি। তবে সব সময়ই দূর থেকে। কখনও কখনও অবশ্য খুব কাছ থেকেই তোমাকে দেখেছি কিন্তু ভয়ে ভয়ে। কিসের ভয়ে জানো? তোমার মার ভয়! সে যদি কোন কারণে আমাকে তোমার কাছাকাছি দেখত, তাহলে নিশ্চয় কিছু অঘটন ঘটত। যাই হোক কফিহাউসে তুমি যখন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক হাসি-ঠাট্টা করতে তখন তোমাকে দেখে তোমার কথাবার্তা শুনে আমার মন ভরে যেত। ঐ কফিহাউসের আড্ডায় তোমার একটা কথা আমি জীবনেও ভুলব না। বেশ মনে আছে, ওথেলো আর ডেসডিমনার ভালবাসা নিয়ে তোমাদের আলোচনা শুরু হয়েছিল। আলোচনা একটু জমে ওঠার পরই ওথেলো ডেসডিমনা হারিয়ে গেল। প্রেম ভালবাসা নিয়ে তোমাদের তর্ক জমে উঠল। সেদিন সব আলোচনার শেষে তুমি বলেছিলে, যে ভালবাসার দ্বারা প্রিয়জনের কল্যাণ হয় না, তা কখনই ভালবাসা না!

কথাটা শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই এবং তোমরা সবাই চলে যাবার পরও আমি ওখানে স্থবিরের মত বসে বসে তোমার কথাটাই ভেবেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

এই দীর্ঘ পঁচিশ বছরের মধ্যে অনেক সময় ভেবেছি, তোমার কাছে ছুটে যাই, তোমাকে আদর করি, জড়িয়ে ধরি, কোলে তুলে নিই। তুমি একটু বড় হবার পর বহুবার ভেবেছি, তোমাকে আমার চোখের জলের ইতিহাস বলি কিন্তু তা পারিনি। শুধু এই কথা ভেবে নিজেকে সংযত রেখেছি যে যদি আমার আবেগ-ভালবাসার আতিশয্যে তোমার কোন ক্ষতি হয়, তাহলে সে দুঃখ আমি সহ্য করতে পারব না। তুমি যখন এম. এ. পড়ার জন্য ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলে, তখন মনে হয়েছিল, না, না, আর দেরি করব না। এখন তুমি বড় হয়েছ, তোমার বিচার-বুদ্ধি হয়েছে, ভাল-মন্দ ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে

শিখেছ। সুতরাং আর দেরি করব কেন? না, তখনও পারিনি। তখনো অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করেছি কিন্তু মা, আর যে পারছি না। বোধ হয় সময়ও বেশি নেই।

তাছাড়া আজ তুমি বিবাহিতা। যে সহপাঠীকে তুমি জীবনসঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করেছ, সেই সুদীপও অত্যন্ত আদর্শবান ও বুদ্ধিমান ছেলে। আজ তুমি শুধু তোমার বাবা-মার সন্তান না, তুমি সুদীপের স্ত্রী। তাইতো আজ তুমি এই পৃথিবীর, এই সংসার ও মানুষ-জন সম্পর্কে নিজস্ব মতামত গ্রহণ করার অধিকারিণী এবং সেই সাহসেই আজ তোমাকে প্রথম চিঠি লিখছি।

মাগো, এত দীর্ঘ ভূমিকার জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তবে শুধু এইটুকু মনে রেখ, আমি দুঃখী, চির দুঃখী। আমি সারাজীবন শুধু চোখের জলই ফেললাম। এই পৃথিবীর কারুর বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ নেই। এই পৃথিবী, এই সংসারের জন্য আমরা সবাই কি উপযুক্ত? না, তা হতে পারে না। আজ আমি মনে মনে বিশ্বাস করি, আমি শুধু হতভাগ্য না, আমি একটি ব্যর্থ, অপদার্থ জীব মাত্র।...

দীর্ঘ চিঠির শেষের দিকে উনি লিখেছিলেন, ধনীর ঘরে জন্মে সুখ পেলেও শান্তি পাইনি। আনন্দময় হয়নি আমার শৈশব-কৈশোরের দিনগুলি। ছোটবেলায় মাতৃহীন হলে কি কোন শিশু বা কিশোরের জীবন মধুর হতে পারে? তবু জীবন এগিয়ে চলল। তারপর একদিন সরকার জমিদারী-প্রথা বিলোপ করলেন ও সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাতিদের শত্রুতাও চরমে উঠল। বাবা সবকিছু হারিয়েও নির্বিবাদে সেক্সপিয়ার চর্চা নিয়ে মেতে রইলেন। তারপর একদিন শুধু ফার্স্ট ডিভিশান না, তিনটে লেটার পকেটে করে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলাম। দেখতে দেখতে প্রেসিডেন্সী কলেজের দিনগুলোও কেটে গেল। বাবা জোর করেই বিলেত পাঠালেন। বাবাকে শুধু বৃদ্ধা বিধবা পিসীর ভরসায় রেখে সাত সমুদ্র পাড়ি দেবার একটুও ইচ্ছা ছিল না কিন্তু বাবার ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করতে না পেরে সত্যি সত্যি একদিন

বোম্বে থেকে পি. অ্যাণ্ড ও লাইনের জাহাজে চড়লাম। বিলেত বাসের মেয়াদ শেষ করে কলিকাতায় ফিরে দেখি, বাবা মৃত্যুশয্যায়। বোধ হয় আমার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন।

জানো মা, বাবার মৃত্যুর দিন পনেরো পর আবিষ্কার করলাম, তিনি আমার পাত্রীই শুধু নির্বাচন করেননি, বিয়ের দিনও পাকা করে গেছেন। না, ঐ দিনই আমার বিয়ে হয়নি কিন্তু ঐ পাত্রীর সঙ্গেই আমার বিয়ে হল। সেটা সাতাশ বছর আগেকার কথা। যাকে আমি বিয়ে করি তিনি শুধু সুন্দরী ছিলেন না, উচ্চশিক্ষিতাও ছিলেন এবং ওর বাবা আমার বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলেন।

অত্যন্ত দুঃখের কথা আমার বিবাহিত জীবন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বিয়ে করলেই কি ভালবাসা হয়? ছন্দপতনের সঠিক কারণটা আজো আমি জানি না। শুধু এইটুকু জানি, আমার স্ত্রীকে আমি সুখী করতে পারিনি এবং তিনি যেদিন আমার বন্ধন থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন, সেদিন আমি নীরবে সম্মতি জানিয়েছিলাম। তারপর একদিন আমার স্ত্রী তাঁর শিশুকন্যাকে কোলে নিয়ে চলে গেলেন। মাগো, সেদিনের সেই শিশুকন্যাটি আর কেউ নয়, তুমি!

আমি তোমার জন্মদাতা হলেও তোমার পিতৃপরিচয় দেবার সাহস বা অধিকার আমার নেই। সবাই জানেন, তুমি ডাঃ সন্তোষ রায়ের কন্যা। আমিও জানি, তিনি তোমাকে পিতৃত্বের স্নেহ-ভালবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন এবং সেজন্য আমিও তাঁর কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব।

আমার পরলোকগতা মার ইচ্ছা পূরণের জন্যই এই চিঠি লিখছি। বাবা এই নেকলেসটা আমাকে দিয়ে বলেছিলেন, তোমার প্রথম সন্তান পুত্র হলে, তোমার পুত্রবধূকে এইটি দিও। আর যদি প্রথম সন্তান কন্যা হয়, তাহলে তার বিয়ের সময় এই নেকলেসটা তাকে দিও। মার ইচ্ছা পূরণের জন্যই এই নেকলেসটা তোমাকে পাঠালাম।

আর একটি কথা। এ সংসারে আমার মেয়াদ আর খুব বেশি দিনের নয় বলেই মনে হচ্ছে। তোমাকে দেবার মত আমার বিশেষ

কিছুই নেই। তাছাড়া আমার কী অধিকার? তবু বলছি, গ্রাচুইটি-প্রফিডেন্ট ফাণ্ডের যা কিছু ইউনিভার্সিটি থেকে পেয়েছি, তার অর্ধেকেরও বেশি চিকিৎসার জন্য ব্যয় করেছি। আগামী সপ্তাহে ভেলোর যাচ্ছি অপারেশানের জন্য। সে জন্যও বেশকিছু ব্যয় হবে। তবু কিছু থাকবে বৈকি। যা থাকবে, তা তোমার সন্তানের জন্য আশীর্বাদ হিসেবে রেখে দেব। স্টেট ব্যাঙ্কের গড়িয়াহাট ব্রাঞ্চে সব নির্দেশ দেওয়া আছে। যদি তোমার ও সুদীপের আপত্তি থাকে তাহলে ব্যাঙ্ক এই টাকা রামকৃষ্ণ মিশনে পাঠিয়ে দেবে।

তোমরা দুজনে আমার প্রাণভরা ভালবাসা নিও।

শৈলেনদা থামলেন।

আমিও চুপ।

কিছুক্ষণ পরে উনি বললেন, এই চিঠিটার কথা আমরা কেউ কোনদিন ভুলব না।

কেন?

উনি একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, যেদিন সকালের কাগজে দেখলাম, ভেলোরে অধ্যাপক অরূপ মুখার্জীর মৃত্যু হয়েছে, সেইদিনই অনুরাধা আর তার স্বামী ঐ পার্সেলটার খোঁজে আমাদের অফিসে এসে হাজির।

বলেন কী?

হ্যাঁ ভাই!

তারপর?

তারপর ঐ পার্সেলটা বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে অনুরাধার কি কান্না।

॥ সাত ॥

পুরানো কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে শৈলেনদার শ্রাদ্ধের কার্ডটা হাতে পেয়েই আজ আমার ওঁর কথা মনে পড়ল। উনি বহুকাল আগেই রিটায়ার করেছিলেন এবং সব রিটায়ার্ড লোকজনদের মতই উনিও রিটায়ার করার পরই অফিসের গল্প বেশি করতেন।

বৌদি সারাজীবন ধরে ঐসব গল্প শুনেছেন বলে অনেক সময়ই বিরক্ত হয়ে ওঁকে বলতেন, ঐ অফিসের গল্প ছাড়া কি আর কোন বিষয়ে কথা বলতে পার না ?

শৈলেনদা হাসতে হাসতে জবাব দিতেন, ওহে সুন্দরী, এই চিঠি-পত্রের মানুষগুলোকে নিয়েই তো জীবন কাটালাম। ওদের নিয়ে ছাড়া আর কাদের নিয়ে গল্প করব ?

সারা জীবন ওদের নিয়েই গল্প করো। বৌদি দু পেয়ালা চা আমাদের সামনে রেখে ফিরে যাবার সময় একবার আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলেন, এমন শ্রোতা বহুকাল পাও না, তাই বলে যাও।

শৈলেনদার সামনে বৌদি যাই বলুন, আমাকে একলা পেলেই উনি বলতেন, সত্যি বলছি বাচ্চু, তোমার দাদার কাছে এইসব ঘটনা না শুনলে ভাবতেই পারতাম না, সংসারে এত ঘটনা ঘটে !

তা তো বটেই !

এ সব অনেক দিন আগেকার ঘটনা। তারপর এই বিশ্বসংসারে কত কি দেখলাম, শুনলাম ! তবু শৈলেনদার কাছে শোনা সব কাহিনী মনে না থাকলেও অনেক কাহিনীই ভুলিনি। বোধহয় কোনদিনই ভুলব না।

জানো বাচ্চু, হঠাৎ একদিন এক অত্যন্ত সৌখীন ভদ্রলোক আমাদের অফিসে এসে এক কুখ্যাত বেশ্যাপল্লীর একটা ঠিকানা বলে খোঁজ করলেন, প্রমোদ রায়চৌধুরীর নামের কোন চিঠি ফেরত এসেছে কি ?

চিঠিপত্রের খোঁজে লোকজনও কি আপনাদের অফিসে হাজির হয় ?

এখনকার কথা বলতে পারি না কিন্তু তখন মাঝে মাঝে কিছু লোক আসতেন।

আচ্ছা তারপর কি হল ?

ও নাম-ধাম, কোথা থেকে চিঠি আসবে ইত্যাদি জানার পর জিজ্ঞেস করা হল, আপনি যখন ঐখানেই আছেন, তখন চিঠি ফেরত এল কেন ?

উনি জবাব দিলেন ?

উনি একটু মুচকি হেসে বললেন, ও-পাড়ার সবাই আমাকে মেজ কর্তাবাবু বলে জানে। আসল নাম কেউই জানে না। তাই বোধহয় কেউ বলেছে, আমি ওখানে নেই।

যাই হোক দু' তিনদিন খোঁজাখুঁজির পর প্রমোদ রায়চৌধুরীর নামের একটা চিঠি পাওয়া গেল ও উনি আবার এলে ওর হাতে দেওয়া হল। চিঠিটা পড়েই উনি পাগলের মত চিৎকার করে উঠলেন, আপনারা সবাই জেনে রাখুন, আমি মলিনার ছেলে, অঘোর রায়চৌধুরীর বিবাহিতা স্ত্রীর ছেলে না!

শৈলেনদা ও তার সহকর্মীরা সবাই ওর কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার? আপনি পাগলের মত চিৎকার করছেন কেন?

আমি চিৎকার করব না? পাটনা হাইকোর্ট জাজমেণ্ট দিয়েছে, আমি মলিনার ছেলে!

আর মানে?

তাহলে শুনুন!

অতীত দিনের বিহারের বিখ্যাত জমিদার কুমুদকান্তি রায়চৌধুরীর ছেলে জমিদার হবার পর পরই সরকার জমিদারী তুলে দিলেন কিন্তু কুমুদকান্তির নাতি অঘোরকান্তি রায়চৌধুরী চাষবাস ব্যবসা-বাণিজ্য করে আবার কোটিপতি হয়েছেন। এই অঘোরকান্তির তিন পুত্র। প্রমোদবাবুই বড় ছেলে। প্রমোদবাবুর জন্মের প্রায় পনের বছর পর ওর মেজভাইয়ের জন্ম। এর বছর তিনেক পরে ছোট ভাইয়ের জন্ম। বহু ধনদৌলত ভূ-সম্পত্তি রেখে অঘোরবাবু পরিণত বয়সেই মারা গেলেন এবং ওর মৃত্যুর পরই শুরু ভ্রাতৃবিরোধ। তারপর যথারীতি কোর্ট-কাছারি। শেষ পর্যন্ত পাটনা হাইকোর্ট।

দুজন মহামান্য বিচারপতি এক মত হয়ে রায় দিয়েছেন, সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে মলিনা শুধু দাসী ছিল না, সে একজন বারবনিতাও ছিল এবং অর্থ বা অলঙ্কারের বিনিময়ে সে বহুজনকেই

নিজের দেহ দান করত। এই কথাও প্রমাণিত হয়েছে যে মলিনার সঙ্গে কোন পুরুষের কোনদিনই আনুষ্ঠানিক বিয়ে হয়নি। তবে সেই সঙ্গে আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করব যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে, প্রমোদের জন্ম মলিনার গর্ভে ও অঘোরকান্তিই তার জন্মদাতা।···

আর ?

প্রমোদ নাবালক হলে তার ভরণপোষণ ও শিক্ষাদীক্ষার জন্য নিশ্চয়ই অর্থের ব্যবস্থা করা হতো কিন্তু তিনি শুধু সাবালকই না বেশ বয়স্কও হয়েছেন। তাই অঘোরকান্তির ব্যবসা-বাণিজ্য বা পারিবারিক সম্পত্তির আয় থেকে তাকে কিছুই দেবার প্রয়োজন নেই। তবে তিনি জীবিতকালে রায়চৌধুরী পরিবারের মূল বসত-বাড়িতে থাকতে পারবেন ও তার জন্য তাকে কোন ভাড়া বা ট্যাক্স দিতে হবে না।

গুড বাই জেন্টলমেন ! গুড বাই !

আগের মতই চিৎকার করে প্রমোদবাবু নাটকীয় ভঙ্গীতে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ডালহৌসীর ভিড়ে মিশে গেলেন।

পরের দিন সকালে কলকাতায় সব খবরের কাগজেই ছোট্ট একটি খবর বেরুল—

শুক্রবার সন্ধ্যায় জনৈক প্রমোদ রায়চৌধুরী (৪৮) হাওড়া পুলের উপর থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

পুলিস সূত্রে বলা হয় যে, মৃত ব্যক্তির পকেটের একটি চিঠি ও হাতের আংটি থেকে জানা যায় যে উনি বিহারবাসী। চেহারা ও পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে মনে হয়, উনি কোন ধনী পরিবারের লোক।

পুলিস আরও জানায় যে মৃত ব্যক্তির স্বহস্ত লিখিত একটি কাগজও ওর পকেটে পাওয়া যায় এবং তার থেকে জানা গেছে সোনাগাছির এক বারবনিতার কাছেই উনি থাকতেন। ঐ বারবনিতার ঘরে ওর যেসব টাকাকড়ি-ঘড়ি-আংটি ইত্যাদি আছে তা ওর ছোট ভাইদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পুলিসকে অনুরোধ করা হয়েছে।

মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য পাঠান হয়েছে।